ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর
ধর্মনগর বিভাগ

(১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ)

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত



শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৭২

ভূমিকা

ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ইংরেজীতে লেখা জেলা গেজেটিয়ার-এর আদর্শে বাংলায় রাজ্যের প্রামাণিক বিবরণ রচনার এক অভিনব পরিকল্পনা করেন এবং তদনুসারে অবসরপ্রাপ্ত, সুদক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগীয় বিবরণ রচনার নির্দেশ দেন। সমকালীন ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রথমাবধি বিভিন্ন বিভাগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই দুরূহ কাজ অচিরেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এই ভাবে ত্রিপুরায় বাংলা গেজেটিয়ার সাহিত্যের সূচনা হয়।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র, প্রবীণ গবেষক ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানা যায় যে, মহারাজার নির্দেশে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত আটটি বিভাগীয় বিবরণের পাণ্ডুলিপি কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেন। তার মধ্যে প্রথম 'উদয়পুর বিবরণ' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর 'ধর্মনগর বিবরণ' ছাপার কাজ সুরু হলেও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে অকস্মাৎ বন্ধ রাখা হয়। পরে আর কোনও বিবরণ প্রকাশিত হয় নি এবং ঐ পাণ্ডুলিপিগুলিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। একমাত্র মুদ্রিত উদয়পুর বিবরণও বহু দিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরার আর্থনীতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান বিবেচনায় শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে এই বিবরণগুলি প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে নিজের সংগ্রহ থেকে পিতার স্বহস্তে লেখা ছয়টি বিবরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি এবং কৈলাসহর ও সদর বিভাগীয় বিবরণের অসম্পূর্ণ এবং অপরিমার্জিত খসড়া দু'টি আমাদের হাতে তুলে দেন। তাঁর এই সহৃদয়তার ফলেই এগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা গেল। এজন্য শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধর্মনগর বিবরণ-এর মুদ্রণকার্য মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রথমে এই বিবরণটি প্রকাশ করা হচ্ছে। অতঃপর অন্যান্য বিবরণ এবং সব শেষে উদয়পুর বিবরণ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হবে।

আমার বিশ্বাস, যাঁরা ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী এবং যাঁরা এবিষয়ে গবেষণা করছেন, চার দশকেরও আগে লেখা এই বিবরণগুলি তাঁদের কাছে সমাদৃত হবে।

গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা অধিকর্তা

সম্পাদকের নিবেদন

স্যার উইলসন উইলিয়ম হান্টার প্রণীত 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্টস অফ হিল টিপারা,' (এস্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল-এর ষষ্ঠ খণ্ড) স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য-গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত আরও কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থে এবং পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার'-এর ত্রয়োদশ খণ্ডে পার্বত্য ত্রিপুরা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ সঙ্কলিত হয় বটে কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতের উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' রচনার পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটিশ এলাকাধীন ত্রিপুরা জেলা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি জে. ই. ওয়েবস্টার প্রণীত 'ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার,-এ প্রকাশিত হলেও ইংরেজ সরকার কর্তৃক তৎকালে 'হিল টিপারা' নামে অভিহিত স্বাধীন ত্রিপুরা সম্বন্ধে কোন গেজেটিয়ার সঙ্কলিত হয়নি। ওয়েবস্টার-এর গেজেটিয়ারএ অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে 'হিল টিপারা'র উল্লেখ আছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গেজেটিয়ারের তুলনায় তা যে যৎসামান্য সে কথা বলা বাহুল্য।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রচিত এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত উদয়পুর বিভাগের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনীতিক বিবরণ ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত 'উদয়পুর বিবরণ' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বলা যেতে পারে। বাংলায় গেজেটিয়ার বা ব্যাপকার্থে ভৌগোলিক অভিধান রচনায় ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পথিকৃত। ছোট-বড় নানা কোষ-গ্রন্থ ইতিপূর্বে সঙ্কলিত হলেও সমকালীন বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় এই ধরনের নদ-নদী, পাহাড়, গ্রাম-শহর, অধিবাসী ও জীবিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক বিবরণ সঙ্কলনে আর কেউ ব্রতী হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। সেই হিসাবে ত্রিপুরার তদানীন্তন আটটি বিভাগের বিবরণ প্রণেতা ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ।

আয়তন যাই হোক না কেন, এধরনের গ্রন্থের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য আগরতলা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার পর সোনামুড়া বিভাগের কানুনগো নিযুক্ত হন। পরের বছর তিনি প্রথমে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পরে পুলিশ, তহশীল ও ফরেস্ট ইনস্পেক্টর পদে কাজ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাব ডেপুটি কালেক্টর রূপে নব সৃষ্ট উদয়পুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কার্যকারক নিযুক্ত হন এবং দশ-এগার বছর ঐ বিভাগেই অতিবাহিত করেন। অতঃপর বিভাগীয় কার্যকারকরূপে ত্রিপুরার সব বিভাগেই কাজ করেন এবং কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে কয়েক বছর সদর বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। বিভাগীয় কার্যকারক থাকাকালে প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর যে বিপুল অভিজ্ঞতা হয় প্রথম থেকেই তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি লিখে রাখেন এবং অবসর গ্রহণের পরে তদানীন্তন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের নির্দেশ অনুসারে 'রাজমালা' অফিসে কাজ করা ছাড়াও 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর' পর্যায়ে উপরোক্ত আটটি বিভাগীয় বিবরণ রচনা করেন।

উপরোক্ত বিবরণসমূহের মধ্যে একমাত্র 'উদয়পুর বিবরণ'ই মুদ্রিত হয়। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) কার্তিক ২য় পক্ষের ত্রিপুরা স্টেট গেজেট-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে এ সম্বন্ধে লেখা হয়: "ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের প্রাচীন কাহিনী বিশদ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিপুরার

পুরাবৃত্ত অনুসন্ধিৎসু ও ইতিহাস চর্চা নিরত ব্যাক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রাপ্তিস্থান 'রাজমালা' কার্যালয়, আগরতলা, মূল্য এক টাকা। ভিঃ পিঃ তে লইলে ১৷৷০ টাকা। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, স্টেট পাবলিশার, আগরতলা।"

উদয়পুর বিবরণ-এর ভূমিকায় এধরনের সঙ্কলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লেখেন ঃ "রাজমালা গ্রন্থে এই রাজ্যের কীর্তিমান রাজন্যবর্গের বিবরণই প্রধানতঃ বিবৃত আছে ও হইতেছে, কিন্তু রাজ্যের ইতিহাস ও জ্ঞাতব্য বিবরণ সঙ্কলিত এমন কোন গ্রন্থ এযাবৎ বিরচিত বা প্রকাশিত হয় নাই, যাহা পাঠ করিয়া আধুনিক গেজেটিয়ারের অভাব কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইতে পারে। তজ্জন্য আমার সংগৃহীত বিবরণগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রচার করার নিমিত্ত অনেকেই আমাকে অনুরোধ জানাইতেছিলেন, কিন্তু কিভাবে তাহা মুদ্রিত ও প্রচার করিব তাহা যখন চিন্তা করিতেছিলাম সেই সময় নবীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বর্তমান প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্তবাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ, বি, এল, এফ, ই, এস, এম, আর এ, এস, মহাশয় ১৩৩৬ ত্রিং, ১২ই ভাদ্র তারিখের চিঠি দিয়া শিলং হইতে আমার নিকট উদয়পুর বিভাগের কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিবরণ জানাবার জন্য অনুরোধ পাঠান। তাহাতে গেজেটিয়ারের ন্যায় আটটি অধ্যায়ে বক্তব্য বিষয় বিভাগকরতঃ কোন্ কোন্ অধ্যায়ে কি কি বিষয় থাকিবে তৎসম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ রাজ্যের অন্যান্য বিভাগগুলি সম্পর্কেও এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত ও প্রচারিত হওয়া শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত জানিয়া, শ্রীশ্রীযুতের শুভ রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে উদয়পুর, ধর্মনগর ও খোয়াই বিভাগের বিবরণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীযুতের দৃষ্ট্যর্থে উপস্থিত করার জন্য তৎসময়ে আদিষ্ট হইয়াছিলাম।"২ পূর্ব উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, স্বয়ং মহারাজা গেজেটিয়ার-এর আদর্শে উদয়পুরের বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করেন। সঙ্কলনের কাজও নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছিল। পুরাতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রতি ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। তথ্যমূলক নিবন্ধ রচনায় পারদর্শিতা ছাড়াও সৃষ্টিমূলক রচনায়ও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় 'বিবিধ ভাবনা' ও 'ব্যথা ও বিদ্রূপ' নামে দু'টি কাব্য গ্রন্থ ও 'গ্রামের কথা' নামে স্বগ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণের পাণ্ডুলিপি থেকে। 'ব্যথা ও বিদ্রূপ' কাব্যে সমকালীন সমাজ ও প্রশাসনের সমালোচনা ও স্বীয় কর্মজীবনের নানা অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতার সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগীয় বিবরণের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি উদয়পুর, ধর্মনগর, খোয়াই ও সোনামুড়া অন্তত এই চারটি বিভাগের বিবরণ রচনা শেষ করেন। এগুলির মধ্যে অবশ্য উদয়পুর বিবরণ রচনার কাজ শেষ হয় সর্বাগ্রে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মনগর এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে খোয়াই, সোনামুড়া, বিলনীয়া ও সাবরুম বিভাগের বিবরণ রচিত হয়। এগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি দুটি বিভাগ অর্থাৎ কৈলাসহর ও সদর বিভাগের অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত খসড়া মাত্র বর্তমানে পাওয়া গেলেও ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে তিনি ঐ দু'টি বিভাগেরও সম্পূর্ণ বিবরণ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছিলেন।

উদয়পুর বিবরণ এর ভূমিকায় বিভাগীয় বিবরণগুলির নামকরণ প্রসঙ্গে লেখা হয় : "প্রথমতঃ. এই গ্রন্থের নামকরণ 'ত্রিপুরা স্মৃতি' করা হইয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুত সমরেন্দ্র বড় ঠাকুর বাহাদুর এই নামে একখানা উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করায় আমার লিখিত এই গ্রন্থের নাম

১ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭১, পৃঃ ৩৯৯

২ উদয়পুর বিবরণ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, আগরতলা স্টেট প্রেস, ১৩৪০ ত্রিং, ভূমিকা

পরিবর্তন করিয়া 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর' রাখা হইল।' তদনুসারে অন্যান্য বিভাগীয় বিবরণেও ঐ শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

জেলাওয়ারী গেজেটিয়ার-এর আদর্শে প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, অধিবাসী, সাধারণ স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, গমনাগমনের পথ, কৃষি, স্থান ও ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়—এই আটটি অধ্যায়ে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশের ফলে প্রত্যেকটি বিবরণ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 'হ্যাণ্ডবুক' রূপে গণ্য হতে পারে।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে রচিত এই বিবরণগুলিতে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী ছাড়া অন্যান্য অংশ মোটামুটি তথ্যভিত্তিক। এগুলি লেখার পর চার দশক অতিক্রান্ত হয়েছে এবং স্বভাবতই এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর কালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে উল্লিখিত বিভাগগুলির প্রশাসনিক ভাগ তথা বৈষয়িক অবস্থার বহু পরিবর্তন তথা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পূর্বোক্ত বিভাগগুলি বিভিন্ন সময়ে নয়টি মহকুমায় বিভক্ত হয় এবং একটি জেলা ভিত্তিক ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলরূপে অভিহিত হয়। সব শেষে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পূর্বোক্ত জেলাটিকেও আবার পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা নামে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়। আলোচ্য ধর্মনগর বিভাগ বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে বর্তমান জনসংখ্যা ও বৈষয়িক বিকাশের ফলে আলোচ্য বিবরণে উল্লিখিত পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে পুরানো হয়ে গেছে কিন্তু সেজন্য পুরানো গেজেটিয়ারের মতই এই সব বিভাগীয় বিবরণেরও মূল্য আদৌ হ্রাস পায় নি বরং চল্লিশ বছর আগেকার তথ্যাদি বিভাগগুলির আর্থনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের 'আকর' রূপেই গণ্য হবে। এ কথা বিবেচনা করেই প্রাচীন বানান পদ্ধতি বর্জন ছাড়া পাণ্ডুলিপির কোন রকম পরিবর্তন না করে শুধু প্রয়োজনবোধে কিছু পাদটীকা মাত্র সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে যে সব আরবী-ফারসী শব্দের সহজে অর্থবোধ হয় না পাঠকদের সুবিধার্থে পাদটীকায় সেগুলির অর্থ দেওয়া হয়েছে।

ধর্মনগর বিভাগের বর্তমান বিবরণের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই বিভাগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন লোকশ্রুতি হিসাবে লেখক উনকোটি পর্বত সন্নিহিত কতকস্থান ত্রিপুরার কোন রাজা কর্তৃক তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদের দান করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরকম কোন তাম্রশাসনের সন্ধান আজ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া যায়নি তবে ধর্মনগর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে এটা অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রাচীন জনপদ গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক কালাছড়া মৌজায় ১৩১৬ ত্রিং সনে (১৯০৬ খ্রীঃ) মৃত্তিকা খননকালে অনেক মাটির নীচে থেকে উত্থিত একটি পাথরের ফলক ও একটি লোহার দীপাধারের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ঐ মৌজায় প্রাচীন দুর্গ, প্রশস্ত রাস্তা ও ইটের বাড়ীর ধ্বংসস্তূপও দেখা গেছে। লেখকের মতে লুসাই কুকিদের অত্যাচারের ফলেই ঐ সব এলাকা কোন সময় পরিত্যক্ত হয়।

'অধিবাসী' অধ্যায়টিও বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। ধর্মনগর বিভাগে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুদের উল্লেখসূত্রে তিনি একশ্রেণীর 'ভেকধারী বৈষ্ণবের, সংখ্যাধিক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদের মধ্যে কিশোরী ভজন ও আনুষঙ্গিক কুপ্রথার প্রচলন ছিল। এছাড়া মালী, ঢুলী প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 'গাজী বাদশার' নামে মাঘ মাসের আনন্দোৎসবে জমায়েত হওয়ার প্রথা, নিত্য ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী হিসাবে এদের মধ্যে 'পিড়ি' অর্থাৎ চেয়ারের বহুল ব্যবহার এবং ভাষার মধ্যে কোন কোন

শব্দের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখেছেন, "কেউ কেউ কুকুরকে 'এঙ্গল' বলে এবং সমস্ত অর্থে 'আস্ত' শব্দ ব্যবহার করে। এঙ্গল বাংলা শব্দ বলে মনে হয় না। 'সমস্ত' অর্থে 'আস্ত' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উপজাতীয়দের সম্বন্ধে, বিশেষ করে হালামদের শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন কিছু নতুন তথ্য এই বিবরণে পাওয়া যায় যা অন্যত্র দুর্লভ। পরিশেষে প্রদত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মৌজার নাম, জমির পরিমাণ, রাজস্ব দাবী, চা-বাগানের সেটেলমেন্ট এবং ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকদের কার্যকালের বিবরণও এই বিভাগ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

ধর্মনগর বিভাগ

সূচী-পত্র

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—প্রাকৃতিক অবস্থা (Physical aspects)	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—ইতিহাস (History)	৫
তৃতীয় অধ্যায়—অধিবাসী	১০
চতুর্থ অধ্যায়—সাধারণ স্বাস্থ্য	১৩
পঞ্চম অধ্যায়—আর্থিক অবস্থা	১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—গমনাগমনের পথ	১৫
সপ্তম অধ্যায়—কৃষি	১৭
অষ্টম অধ্যায়—স্থান ও ব্যক্তিবিশেষ	১৯
পরিশিষ্ট—	২১

ধর্মনগর বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক অবস্থা (Physical aspects)

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর অতি প্রাচীন স্থান। ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণ উত্তর হইতে রাজ্য বিস্তার করিয়া যে দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবং স্থানীয় অবস্থা পর্যালোচনায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৮০ শকাব্দ হইতে মহারাজা ধর্মমাণিক্য রাজত্ব করেন জানা যায়। তৎপূর্বেও ধর্মনগরের প্রসিদ্ধি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে, রাজা ডাঙ্গর ফার পুত্রগণ মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ধর্মনগরে তাঁহাদের একজন রাজা হইয়াছিলেন।

যথা ;

"রাজা ফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান॥
* * * *
আর পুত্র ধর্মনগরেত রাজা কৈল।" ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র পাওয়া যায় ;

"সন্ন্যাসিয়ে বোলে আমি জাতি যে ত্রিপুর।
অগ্নি কোণে রাজ্য মোর হয়ে বহু দূর॥"

রাজমালার প্রামাণিকতা ও ধর্মমাণিক্যের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অন্যত্র লিখিত আছে ;

"হেন মতে মহারাজ শ্রীধর্ম্মমাণিক্য।
যতেক করিল ধর্ম্ম কহিতে অশক্য॥
পূর্ব্বে যত লিখা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে।
পয়ার গাথিল কথা সকলে বুঝিতে॥
সুভাষাতে ধর্ম্মরাজ রাজমালা কৈল।
দৈত্য খণ্ড করিয়া পৃথিবীর নাম থুইল॥
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
দৈব যুগে[১] আপনে পাইল সেই পুঁথি॥"

সংস্কৃত রাজমালায় আছে ;

"একাদশ নবত্যব্দে শাকে পঞ্চদশে তথা।
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেন লিখ্যায়ামাস যত্নতঃ॥"

১ শুদ্ধরূপ—দৈবযোগে।

শ্রীধর্ম নামে একাধিক নরপতি ত্রিপুরার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কোন্ রাজার সময়ে ও নামানুসারে ধর্মনগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করার নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। এই ধর্মনগরে শাসন-কেন্দ্র থাকার সময়ে রাজ্যের সীমানা কোন্ দিকে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বর্তমান শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ বা সমস্ত স্থানই তখন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;

"পঞ্চখণ্ড ক্রমে তবে ইটাতে আসিল।
ভানুনারায়ণ তাতে তালুকদার ছিল॥
চারিদিকে জমিদারে কষ্ট দেয় তারে।
সীমানা করিয়া দায় দিতে ইচ্ছা করে॥
নৃপস্থানে প্রতিগ্রহ চাহিলেক ভূমি।
উৎসর্গিয়া তাম্রপত্রে দিলা এই পাইলা তুমি॥
সেই হনে চৌধুরী হইল দ্বিজবর।
তথা হনে নরপতি চোয়াল্লিশ আইল।
পক্ষী মাংস ইত্যাদি যে মৃগয়া করিল॥
* * *
তথা হনে নরপতি বালিশিরা গেল।
বিজয়পুর নামে গ্রাম তথাতে বৈসাইল॥
কতদিন থাকি তথা উনকোটি গেল।
এক উনকোটি লিঙ্গ তথাতে দেখিল॥
লঙ্গলায়ে গিয়া ধর্ম্মনগরেত উত্তরি।
পূজিলেক বিধি মতে তথা হরগৌরী॥
ডাঙ্গর ফার বাড়িতে রহিয়া কতদিন।
নারেঙ্গ কমলা বাগ দেখিল প্রবীণ॥
তথা হতে নরপতি কতকাল ক্রমে।
ডাঙ্গর ফার আর বাড়ি তমকাম সীমে॥"

১৩১৮ ত্রিং সনে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত টেংরা মৌজা নিবাসী বয়োবৃদ্ধ প্রণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট জানা গিয়াছিল যে, পঞ্চখণ্ড নামক পরগণা ত্রৈপুর নরপতি ব্রাহ্মণগণকে দান করার পুরাতন দলিল শ্রীহট্টে আছে কিন্তু অনুসন্ধানে তাহা পাওয়া যায় নাই। বর্ণিত ব্রাহ্মণগণের এক জনের নাম শ্রীপতি ও অপরের নাম নিধিপতি ছিল বলিয়াও তিনি জানাইয়াছিলেন। টেংরা মৌজায় এখনও বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান আছে। ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম ফা এক বিশেষ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটি স্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমিত ইষ্টক নির্মিত একটি যজ্ঞকুণ্ডকে সেই হোমের স্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে উনকোটী পর্বতের সমীপবর্তী কতক ভূমি তাম্রশাসন দ্বারা দান করার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ, 'প্রথম খণ্ডে' বংশ বৃত্তান্ত উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ; "যখন বঙ্গদেশে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটে নাই, তাহার প্রায় নবতি বর্ষ পূর্বে ত্রৈপুর নরপতি আদি ধর্মফার আহবানে শ্রীহট্টে বৎস, বাৎস, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন তপস্বীর শুভাগমন হয় বলিয়া কথিত আছে। ইঁহারা এক বৎসর এদেশে অবস্থান পূর্বক পুনরায় স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি সহ প্রত্যাগমনকালে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উপরোধে বাধ্য হইয়া এদেশে আসিয়া বাস করেন। এই দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক বিপ্র নামে খ্যাত।" ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে, বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের বর্তমান সীমানার ন্যায় পূর্বে রাজ্যের সীমানা খর্ব ছিল না।

বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে 'রাজবাড়ী' নামে একটি পুরাতন মৌজা আছে। এই মৌজায় এবং বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি পুরাতন বসতি, ইষ্টকালয় ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নূতন অধিবাসিদিগের নিকট পুরাতন স্থানগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। উদয়পুর বিভাগের ন্যায় বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের কোন স্থানে প্রাচীন অধিবাসিদের বংশধরগণের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের উত্তরে শ্রীহট্টের মৌলভীবাজার ও করিমগঞ্জ সবডিভিশন, পূর্বে করিমগঞ্জ সবডিভিশন ও আসামের লুসাই জেলা, দক্ষিণে লুসাই ও কৈলাসহর বিভাগ এবং পশ্চিমে মৌলভীবাজার ও কৈলাসহর বিভাগ। কিছুকাল পূর্বে এই বিভাগ কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৩৩০ ত্রিং সনের সেন্সাস অনুস'রে বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,৮৫৬ ছিল। এই বিভাগের আনুমানিক বিস্তৃতি ৪৫০ বর্গ মাইল ধরা হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব-উত্তর সীমানার তর্ক বহুকাল যাবৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিবেচনা ও বিচাবাধীন আছে বলিয়াই শুনা যাইতেছে, কিন্তু এই তর্ক কখনও স্বাধীন ত্রিপুরার অনুকূলে নিষ্পন্ন হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। লঙ্গাই নদী, খাল ও জুড়ী নদী, রাগনা ছড়া, ধলাই ছড়া, বংশুল, ছাতাচূড়া জরিপী লাইন ইত্যাদির অবস্থিতির ব্যাখ্যা দ্বারা বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের এত অধিক পরিমাণে খর্বতা সংঘটিত হইয়াছে যে তজ্জনিত ক্ষতি উদ্ধারের চেষ্টা কখনও সফল হইবে কিনা কে বলিতে পারে ?

মিঃ পাওয়ার ১৮৭২ খৃীঃ ৪ঠা এপ্রিলের পত্রে লিখিয়াছেন ; "The territory over which the Raja has a bonafide nominal control is bounded on the east by a range of hill running southward from Chatterchora to Sarphol peak and thence in a zig zag line to Sardiang. On the east of this line the Lushai land commences; and on the west there is much uninhabited and unexplored jungle." ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সকল স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানেরও অনেক স্থান সদাশয় গভর্ণমেন্টের কর্মচারী বিশেষের চতুরতামূলক কার্য দ্বারা ক্রমশঃ ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর্মনগর টাউনের অনতিদূরবর্তী রাজগী চা-বাগানেব নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে যে ছড়া 'ধলাই' ছড়া নামে আখ্যাত হইতেছে, তাহাই পূর্বে 'রাগনা' ছড়া নামে পরিচিত ছিল বলিয়া স্থানীয় প্রাচীন লোকদের নিকট জানা যায়। 'বালিয়া' ও "পিপলা" ছড়ার অযথা নাম পরিবর্তন দ্বারাও অন্যায় মতে সীমানার খর্বতা সাধিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ধর্মনগর বিভাগের সীমানা সংক্রান্ত বিষয় বিচারাধীন আছে বলিয়া এস্থলে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

মণিপুর রাজবংশীয় ধর্মজিৎ রাজকুমার ধর্মনগর বিভাগে স্বীয় নামে ৮৭ নং কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া 'ধর্মপুর' নামকরণে একটি মৌজার সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাতন ধর্মনগরের

প্রাচীনত্বের সহিত এই রাজকুমারের নামের কোন সংশ্রব নাই। স্থানীয় উন্নতি ও আবাদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে কৈলাসহর বিভাগ হইতে পৃথক রাখিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার কালেক্টরীর অন্তর্গত মিরাশ১ ও তালুকগুলির পুরাতন দলিলে অনেকগুলি 'জুমের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান ধর্মনগর ও শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্থানই পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ক্রমশঃ তাহা আবাদিত হইয়া বসতিযুক্ত জনপদ ও শস্যক্ষেত্রাদিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। বর্তমান লংলা এবং টেংরা পরগণা ও গ্রামের নাম তৎ তৎ নামীয় কুকী সর্দারের নামানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৩২৩ ত্রিপুরাব্দে সাধারণ ও বিশেষ খারিজা২ তালুকসহ ধর্মনগর বিভাগে প্রায় ৮০০আটশত ছোট বড় তালুক তৌজিভুক্ত৩ ছিল। এই সকল তালুক বন্দোবস্ত দ্বারা সহজে আবাদ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্দরুন নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে ফটিকুলি, ধর্মনগর ও কুর্তি এই তিনটি তহশীল কাছারী আছে। ফটিকুলি টাউনে একটি থানা এবং লঙ্গাই নামক স্থানে একটি তহশীলযুক্ত থানা স্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন রাগনা, সাতসাঙ্গম ও কুর্তি ও লঙ্গাই প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বনকর ঘাট, ফরেস্ট রেঞ্জ ও গার্ড আফিস স্থাপিত হইয়াছে। লালছড়া, কালাছড়া, উপ্তাখালি, প্রত্যেকরায়ছড়া, হাফলংছড়া, রাগনাছড়া, কুকীনালা, কালাগাঙ্গ, বালি ও পিপলাছড়া প্রভৃতি অনেকগুলি ছড়া ও খাল জুরী, কুর্তি ও লঙ্গাই প্রভৃতি নদীতে পতিত হইয়া ব্রিটিশ এলাকার নিম্ন প্রদেশ অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। জুরী নদীর তীরবর্তী পুরান গারদ নামক স্থানের সন্নিকটে পূর্বে ধর্মনগর বিভাগীয় আফিস স্থাপনে কিছুকাল কার্য পরিচালিত হইতেছিল। ফটিকুলি নামক স্থানে বিভাগীয় আফিস স্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব কথিত স্থানে তহশীল কাছারী মাত্র স্থাপিত আছে। এই তহশীল কাছারীই ধর্মনগর তহশীল কাছারী নামে পরিচিত। পূর্বে এই রাজ্যের সর্বত্রই পুলিশ ও তহশীল কার্য একই কর্মচারী দ্বারা নির্বাহ হইত। উক্ত ধর্মনগর থানার হরিশ দারোগার নামানুসারে তথায় হরিশগঞ্জ বাজার স্থাপিত হইয়াছিল।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে ধর্মনগর বিভাগের বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। পূর্বে ধর্মনগর বিভাগে আগর ও নাগেশ্বর বৃক্ষ সর্বত্র দেখা যাইত কিন্তু এখন তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। এই বিভাগের চিড়াপাথর, হাড়েরগঞ্জ এবং অন্যান্য কতিপয় স্থানে লৌহ, কয়লা, লবণ ও কেরোসিনের খনি ও চূণাপাথর আছে জানা যায়। স্টেট জিওলজিস্ট মিঃ অশোক বসুর রিপোর্টে তৎসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ স্থলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মনগর বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। জঙ্গলাবাদ ও পানীয় জলের সংস্থান এবং রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে ; কিন্তু এই উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে হওয়া আবশ্যক।

ধর্মনগর ও কৈলাসহর বিভাগের মধ্যবর্তী উনকোটী পর্বত ও ইন্দুর আইল পর্বতশ্রেণীই ধর্মনগর বিভাগের প্রধান পর্বত বলা যাইতে পারে। ত্রিকোণমিতি জরিপের বংশুল ও ছাতাচূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত সীমার লাইন ও ছোট বড় পর্বতের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নদী ও ছড়াগুলি উক্ত পর্বত ও তন্মধ্যস্থিত নিম্ন জলাভূমি হইতে সাধারণতঃ বহির্গত হইয়াছে।

---

১ (আ)—বংশানুক্রমিক উপভুক্ত ভূসম্পদ।
২ (আ)—দাখিলী।
৩ (আ)—খাজনার তালিকাভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস (History)

ত্রৈপুর নরপতি ডাঙ্গরফার অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে একজন যে ধর্মনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে রাজমালার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎসময়ে যে ধর্মনগর সমৃদ্ধ স্থান ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ধর্মনগরে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন রাজমালায় তাহার বিবৃতি পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতে পারে। ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে ধর্মমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮৪৮ ত্রিপুরাব্দে বসন্তরোগে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা নগরীর প্রসিদ্ধ ধর্মসাগর ১৩৮০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষ্যে কৌতুকাদি অষ্টব্রাহ্মণ ঊনবিংশতি দ্রোণ ভূমি দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়। সেই সময়ে আলোচ্য ধর্মনগর বিভাগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার সুবিধা দেখা যায় না।

ত্রৈপুর রাজপরিবারের গৃহবিবাদ ও অন্যান্য কারণে রাজ্য মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও কুকীর উৎপাত আরম্ভ হইলে ধর্মনগর অঞ্চল ক্রমশঃ জনশূন্য হইতে থাকে। দেওয়ান নীলমণি দাস মহাশয়ের সময়ে কৈলাসহর বিভাগ স্থাপনের পর কায়েমী তালুকাদির স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া সন্নিকটবর্তী ব্রিটিশ এলাকার বিভিন্ন মৌজা হইতে মুসলমান ও নানা শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদের পূর্ব বাসস্থানের নামানুসারে মৌজার নামকরণ করিয়া এতদঞ্চলে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া আবাদ বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছিল। লাতু, সাবাজপুর, টুঙ্গিবাড়ী, বটরসি ইত্যাদি বর্তমান মৌজাগুলি উক্ত অবস্থার পরিচায়ক। ১৩২৩ ত্রিং সনের শেষ ভাগে বর্তমান বিভাগীয় আফিস জঙ্গীগারদের টীলার উপরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই স্থান প্রাচীন পদ্মপুর মৌজার অন্তর্গত। এই মৌজায় মাটীর নীচে বহু ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে এবং ফটিকুলি দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটি ইষ্টক নির্মিত পাকা ঘাটের প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ফটিকুলি নামে অপর একটি বড় দীঘিকা ইহার অনতিদূরে আছে। ভূতপূর্ব ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযুত বসন্তকুমার বর্মণ পূর্বকথিত ধর্মনগর নামক স্থান হইতে প্রথমোক্ত ফটিকুলি দীঘির পাড়ে বিভাগীয় আফিসের গৃহাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানকেও ধর্মনগর নামেই অভিহিত করা হইতেছে।

কালাছড়া মৌজায় জমরমহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার বাড়ীতে মৃত্তিকার নীচে একটি পুরাতন ইষ্টকালয়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ১৩১৬ ত্রিং সনে এই স্থানে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল সংবাদে রাজধানী হইতে বিশ্বস্ত কর্মচারী পাঠাইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। সেই সময়ে তথায় মৃত্তিকা খনন করাইলে অনেক মাটির নীচে একখণ্ড প্রস্তর ফলক এবং লৌহনির্মিত উচ্চ একটি দীপাধার পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থানেরই সন্নিকটে অনতি-উচ্চ ভূমিতে কয়েকটি প্রাচীন কীর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে মাটি খনন করা হইলে এই বিভাগের অনেক স্থানেই প্রাচীন কীর্তির আরও সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। পূর্ব কথিত লৌহনির্মিত দীপাধারটি তহশীল কাছারীতে রক্ষিত হইতেছে। এই লৌহ দীপাধারের নির্মাণ কৌশলও বিশেষজ্ঞদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

কালাছড়া মৌজার হায়দর ও কাদির মহম্মদ নামে দুইজন প্রজার বাড়ীর নিকটে মৃত্তিকার প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গের ন্যায় প্রাচীন স্থান আছে। মধ্যের প্রাচীর দ্বারা তাহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীরের মধ্যে চারিটি পুরাতন পুষ্করিণী বিদ্যমান। এই বিস্তীর্ণ স্থানের মধ্যে কয়েকটি পুরাতন ইষ্টক স্তূপ বা ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে শনিছড়ার দিকে প্রত্যেকরায় মৌজার ফটিকুলি ও রাজবাড়ী মৌজার দিকে দীঘলবাক নামক স্থান হইয়া রাগনা-দুর্গাপুর মৌজার দিকে এবং তৎপর বউটুলি হাওরের দিকে যাতায়াতের পুরাতন প্রশস্ত সড়কের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাগনা বাজার হইতে ফটিকুলি টাউনে যাতায়াতের যে সড়ক আছে তাহাও পুরাতন সড়কের সংস্কার মাত্র। ১৩১৯।১৩২০ ত্রিং সনে এই রাস্তার এবং হাকাইছড়ার উপরিস্থিত কাষ্ঠনির্মিত সেতুর পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে।

লালছড়া মৌজার মুজাফর আলী ওরফে মজন মোল্লার পুরাতন বাড়ীর সন্নিকটে একটি পুরাতন বড় দীর্ঘিকা আছে। ইহার পাড়ে বহু পুরাতন ইষ্টক স্তূপ থাকায় এখন লোকে ইহাকে 'ইটুলি দীঘি' বলে। প্রত্যেকরায় মৌজায়ও একটি বড় দীঘি আছে। ইহার জল অতি পরিষ্কার এজন্য স্থানীয় লোকে ইহাকে 'সাফা দীঘি' বলে। এই উভয় দীঘির পুরাতন ও প্রকৃত নাম কি ছিল তৎসম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী বা প্রচলিত প্রবাদ শুনা যায় নাই।

তালুকদার আমীর আলী চৌধুরীর পিতা কাসেম আলীর নামে পরিচিত কাসেমনগর মৌজায় ছোট বড় বহুসংখ্যক পুরাতন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সন্নিকটেই 'ভট্টের দীঘি' নামে একটি বহু পুরাতন দীর্ঘিকা আছে। শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্থলে ভট্টাচার্যকে সংক্ষেপে ভট্ট বা ভট্ বলা হইয়া থাকে। এই স্থানে পূর্বে ভট্ট বা ভট্টাচার্য কিংবা ভাট শ্রেণীর লোকের বাস ছিল মনে করা যাইতে পারে।

বর্তমান ধর্মনগর বিভাগ সংলগ্ন ব্রিটিশ এলাকান্তর্গত লংলা পরগণায় অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে ধর্মনগরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া স্থানীয় লোকদিগের নিকট জানা যায়। শঙ্করপুর মৌজার কালীজয় ভট্টাচার্য ও রমেশচন্দ্র সেন এবং চন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির পূর্বপুরুষগণ ধর্মনগরবাসী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। লুসাই কুকীদিগের উৎপীড়নসময়ে প্রাচীন অধিবাসিগণ ব্রিটিশ শাসনাধিকারে পুরাতন 'রাজার জাঙ্গালের' পার্শ্ববর্তী শঙ্করপুর, নর্তন, করেরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইটা ও চোয়াল্লিশ পরগণার ও অন্যান্য স্থানের দশগোত্রীয় সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ ত্রিপুরাধিপতির আনীত হওয়ার বিষয় পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। লংলা পরগণার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে 'ব্রাহ্মণপাড়া' নামক দীঘি-পুষ্করিণী-সমন্বিত জনশূন্য স্থান পূর্বে ঐ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকে অদ্যাপিও সেই স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন।

১৩০৫-১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে কৈলাসহর বিভাগ হইতে ধর্মনগর বিভাগ পৃথক করা হইয়াছে। শ্রীযুত বাবু অসিতচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (পরে ইনি দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন); বাবু ভুবনমোহন গুপ্ত, বাবু চন্দ্রকান্ত বসু, বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান ঠাকুর বঙ্গচন্দ্র দেববর্মা, বাবু বসন্তকুমার বর্মণরায়, বাবু ত্রিবেণীমোহন বর্ধন, বাবু দ্বারকানাথ দত্ত, ঠাকুর শ্যামলাল দেববর্মা, ঠাকুর তারিণীচরণ দেববর্মা, ঠাকুর রেবতীমোহন দেববর্মা, বাবু মহেন্দ্রকুমার পাল, বাবু রামকমল চক্রবর্তী, বাবু প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র

দত্ত প্রভৃতি কেহ একবার কেহ বা একাধিকবার ধর্মনগর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক পদে কার্য করিয়াছেন।

১৩১৭ ত্রিং সনের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১৮ ত্রিং সনের মাঘ মাস এবং ১৩২১ ত্রিং সনের আষাঢ় মাস হইতে ১৩২৪ ত্রিং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত স্থানীয় উন্নতিজনক কতকগুলি কার্যের বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। রাজমন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের সময়ে ১৩১৭ ত্রিপুরাব্দে রেভিনিউ-সুপারিন্টেডেন্ট মহাশয়ের পরিদর্শন উপলক্ষে ধর্মনগর বিভাগীয় আফিসে যে সকল বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কর্মচারীর পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই তাহার সন্তোষজনক সমাধান করা হইয়াছিল।

২। সূত্রধর শ্রেণীর কারিগরের স্থানীয় অভাববশতঃ হবিগঞ্জ হইতে এই শ্রেণীর শিল্পী আনাইয়া সরকারী প্রয়োজনীয় বহুসংখ্যক আসবাব প্রস্তুত করাইয়া কার্যের ও কাগজপত্রাদি রক্ষায় যথোচিত সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তৎপূর্বে বংশ-মঞ্চই নথীপত্রাদি রক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট গণ্য হইত।

৩। শ্রী গৌরীনাথ নামক জনৈক প্রজা হইতে কতক স্থান গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করতঃ তাহাতে মধ্যইংরেজী স্কুলগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। ১৩২২ ত্রিং সনে এই স্থানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানেই বীরবিক্রমকিশোর হাই স্কুল পরে স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে।

৪। পূর্বে থানা ও তহশীল কাছারী একটি ছোট টীলার উপর স্থাপিত ছিল; তাহাতে কার্যের অসুবিধা হওয়ায় ১৩১৭-১৩১৮ ত্রিং সনে অন্যত্র একটি ছোট পুষ্করিণীর আয়তন বৃদ্ধি ও সংস্কার করাইয়া ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক স্থানে পুলিশ থানা স্থাপন করা হয়। তৎসময় পোষ্টাফিসের প্রয়োজনেও স্থান খাস করা হয়।

৫। কুতি তহশীল কাছারী কুতি বাজারের মধ্যে নিতান্ত অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ছিল। ১৩১৭-১৩১৮ ত্রিং সনে সন্নিকটবর্তী পরিত্যক্ত আনারস বাগান পরিশোভিত উচ্চ ভূমির উপর এই তহশীল কাছারী স্থানান্তরিত ও গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল।

৬। ১৩১৭ ও ১৩১৮ ত্রিং সনে রাধাপুর ও আমটীলা মৌজার পাঠশালা নিম্ন বাঙ্গালা স্কুলে উন্নীত হয়। ১৩২২ ত্রিং সনে রাগনা মৌজার পাঠশালাটিকেও নিম্ন বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত করিয়া আবশ্যকীয় সুবন্দোবস্ত করতঃ ভবিষ্যতে ধর্মনগরে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়।

৭। ১৩১৮ ত্রিং সনে ফটিকুলি হইতে রাগনা পর্যন্ত রোডের এবং হাকাইছড়ার উপরিস্থিত কাঠনির্মিত সেতুর বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়।

৮। ১৩১৮ ত্রিং ভাদ্র মাসে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে 'রাধা-কিশোর পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩২১ ত্রিং হইতে ১৩২৪ ত্রিং সন পর্যন্ত এই লাইব্রেরী

দ্বারা স্থানীয় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৩২৩ ত্রিং পৌষ মাসে পলিটিক্যাল এজেন্ট (Captain Williams) এই লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করত: পুরস্কার প্রদান করেন। এই লাইব্রেরীর সংশ্রবে 'ইউনিয়ন ক্লাব' নামে ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার একটি ক্লাব খুলিয়া ব্যায়াম চর্চারও সুবিধা করা হইয়াছিল।

৯। ১৩১৮ ত্রিং সনে স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দির নির্মাণ ও সংস্কার কার্য সাধিত হয়। ১৩২১ ত্রিং সন হইতে দেবতার সেবাপূজার ব্যয়ের বিশেষ বন্ধান করা হয়। ১৩২২ ত্রিং সনে ইহার আরও উন্নতি সাধিত হয়।

১০। ১৩২৩ ত্রিং সনে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে নূতন মনোনীত টীলার উপরে বিভাগীয় আফিস-গৃহাদি নির্মাণের অনুষ্ঠান হয় এবং বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের কতক কার্য শেষ করা হয়। পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরীর সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

এই সময়ে সরকারী আমলা কর্মচারীদের বাসার স্থান, বাৎসরিক মেলার স্থান, ইউনিয়ন ক্লাবের খেলার স্থান রীতিমত খাস করত: অনেক বিষয়ে সুবিধা করা হইয়াছিল।

১১। ফটিকুলি বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জুরী নদীর তীরে মৃতদেহ সৎকারের স্থান মনোনীতক্রমে একটি পঞ্চবটী প্রস্তুত করার অনুষ্ঠান ঐ সময়েই হইয়াছিল। তৎপূর্বে হিন্দুদের শ্মশান বহুদূরে হাকাইছড়ার পাড়ে নির্দিষ্ট ছিল।

১২। ১৩২৩ ত্রিং সনে লঙ্গাই থানা ও ফরেস্ট আফিস দামছড়ার পাড়ে টীলার উপরে নূতন ভাবে নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে লঙ্গাই নদীর অপর পাড়ে ব্রিটীশ ফরেস্ট বিট আফিস অবস্থিত।

১৩। শিলুয়া নামক স্থানে বনকর ঘাট থাকার সময়ে ব্রিটিশের ফরেস্ট কর্মচারীদের সঙ্গে ত্রিপুরার ফরেস্ট কর্মচারীদের স্বার্থ সম্পর্কে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং ইহার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বনকর সম্পর্কিত ক্ষতি সংঘটিত হইত। এই সকল ক্ষতি নিবারণ ও কার্যের সুবিধা করার উদ্দেশ্যে ১৩২৪ ত্রিং সনের বৈশাখ মাস হইতে রাগনা ছড়ার পাড়ে রাগনা বাজারের এক পার্শ্বে বনকর আফিস স্থাপন করা হয়।

১৪। ফটিকুলি টাউনের পশ্চিম দিকস্থ নবীন হাওলাই মুদাফতি১ খাস জোত ভূমিতে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকশ্রেণীর লোকদিগকে স্থায়ীভাবে বসত করাইয়া স্থানীয় উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ৭৭ নং কায়েমী তালুক সম্পর্কিত এই স্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত অনেক লিখাপড়া করিতে হইয়াছিল। ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের পরিবর্তনবশত: প্রস্তাবিত কার্য হইতে পারে নাই।

১৫। ১৩২৩ ত্রিং সনের শেষভাগে কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে প্রেরণ জন্য অনেকগুলি আগরের চারাগাছ সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং যথাস্থানে তাহা প্রেরিতও হইয়াছিল। তৎসময় নূতন বিভাগীয় আফিসটীলার চতুর্দিকে ৬০ ষাটটি আগরের চারা রোপণ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই চারাগাছগুলি পরবর্তী সময়ে অযত্নে বিনষ্ট না হইলে এবং বড় হইলে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে।

১ (ক্ষা)—ভূমির পূর্ব অধিকার।

১৬। খাল ও জুরী নদীর ইজারাদার হাজির আলী মিঞা, তালুকদার আমীর আলী, ছব্দান মিঞা, কাতির আলী মুন্সী, কুতি তহশীলের ওয়ারিশ মহাম্মদ, ফটিকুলি মৌজা নিবাসী আবজল মহাম্মদ, সরাফত আলী, আম্বর আলী মুন্সী, স্থানীয় উকিল বিনোদবিহারী ঘোষ, রজনী কর পিয়ন, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, এঃ সেরেস্তাদার উপেন্দ্রজিৎ রাজকুমার, ভাগ্য সিং মণিপুরী প্রভৃতি সম্পর্কিত অনেকগুলি মোকদ্দমায় বিশেষ রূপ দৃঢ়তার সহিত দুষ্টের দমন ক্রমে ন্যায় বিচারের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। ঐ সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নথী বিভাগীয় আফিসে আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এস্থলে মাত্র নামগুলির উল্লেখ করা হইল।

১৭। জিলা ত্রিপুরা পং সরাইল মৌজা বুড়িশ্বরের প্রসিদ্ধ ডাকাইতি ও অন্যান্য ডাকাইতি সংসৃষ্ট চিকাচুপির ডাকাইত দলের সর্দার মহব্বত আলী ও আরও কতিপয় ডাকাইত ধর্মনগর বিভাগে ধৃত হইয়া ব্রিটিশ কোর্টে চালান হইয়াছিল। এই উপলক্ষে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকজন পুলিশ বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিল।

১৮। লঙ্গাই এবং খাল ও জুরী নদীগুলির বনকর সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত লিখা-পড়া করিয়া অনেক বিষয়ের শৃঙ্খলা বিধানের উপযুক্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তৎসময় আবগারী বিঝাড়া১ নিবারণ এবং চা-বাগানের ইউরোপীয় ম্যানেজার সাহেবদিগের সহিত সহানুভূতি এবং সদ্ভাব স্থাপনেরও যথোচিত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কোন পলিটিক্যাল এজেন্ট ধর্মনগরে আগমন করেন নাই।

১৯। ধর্মনগর টাউনের বার্ষিক মেলা ও কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে নানারূপ উন্নতি বিধান করা হইয়াছিল। ফটিকুলি দীঘির জলের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতঃ পশ্চিম পাড়ের রাস্তা খুলিয়া চারি পাড় দিয়া লোক যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২০। ১৩০৫-১৩০৬ ত্রিং হইতে ১৩২২ ত্রিং সন পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত এবং ১৩২০ ত্রিং সন পর্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত নথীপত্রাদির রীতিমত ফিরিস্তি ও রেজেস্টারী প্রস্তুত করাইয়া আগরতলায় মহাফেজখানায় প্রেরণের উপযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্বে নথীপত্রাদি নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল।

উক্ত ও অন্যান্য কার্যগুলি ভিন্ন অনেকগুলি রাস্তার 'এলাইনমেন্ট' এবং কয়েকটি পুষ্করিণী খননের অনুষ্ঠান দ্বারা স্থানীয় উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। উক্ত বিষয়গুলির কোন কোনটি এখন সামান্য বিবেচিত হইলেও তৎসময়ের অবস্থা এবং অসুবিধা চিন্তা করিলে ঐ সকলের গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হইবে। রাগনা বাজার হইতে ধর্মনগর তহশীল কাছারী এবং সেখান হইতে সাত-সঙ্গমও শিলুয়া বনকর ঘাট পর্যন্তও একটি রাস্তার লাইন নির্দিষ্ট করিয়া জুরী নদীর পূর্ব পাড় দিয়া কতক কতক স্থানের জঙ্গল কাটান হইয়াছিল।

১ চোরাই চালান

তৃতীয় অধ্যায়

অধিবাসী

বর্তমান ধর্ম্মনগর বিভাগে রাগনা-দুর্গাপুর মৌজায় কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের স্থায়ী বসতি আছে। দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের নামে এই মৌজার নামকরণ হইয়াছে। তিনি কৈলাসহর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে এই স্থানে উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজপুরুষগণ আগ্রহের সহিত কোন নীতি অবলম্বন না করায় ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক চেষ্টা দ্বারা সুফল দেখা যাইতেছে না। মণিপুরী ও পার্বত্য হালাম শ্রেণীর প্রজা ভিন্ন শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী নাথ বা দেবনাথ, নমঃশূদ্র, মালী, পাটনী, ঢুলী, মুচী, চা-বাগান হইতে আগত কুলী প্রজা যথা উড়িয়া, নাগপুরী ও সাঁওতাল শ্রেণীর নবাগত হিন্দুর সংখ্যাও অধিক দেখা যায়। তিলি, পাল, দাস এবং দে ও দেব শ্রেণীর জলআচরণীয় প্রজাও কয়েক ঘর আছে। ধর্মনগর বিভাগের পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকান্তর্গত মৌলভী বাজার, করিমগঞ্জ ও লুসাই পার্বত্য প্রদেশ হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান প্রজার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাথারকান্দি ও তন্নিকটবর্তী দুহালিয়া পর্বতশ্রেণী বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত এবং কোন কোন স্থান এ রাজ্যের লাহারপুর জমিদারীর অন্তর্গত। পূর্বে এই সকল স্থানও স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত এবং শাসনকেন্দ্র ধর্মনগরের অধীনে ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকদিগের নিকট জানা গিয়াছে। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে পাথারকান্দি গং স্থানের জমিদারী সরকার পক্ষে খরিদ করা হইয়াছে। এই স্থানের অনেক মণিপুরী প্রজা বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিতেছে। প্রজাদের অনেকে কায়েমী তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খরিদ করিয়া অথবা বহুলোক একযোগে তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া চাষ-আবাদ কার্য করিতেছে। সরকারী খাস মহালের প্রজার সংখ্যা মোটের উপর অধিক হইবে কিনা সন্দেহ। মধ্য শ্রেণীর তালুকী সত্ত্ব নিম্ন শ্রেণীর প্রজার হস্তগত হওয়ায় অনেক বিষয়ে স্থানীয় উন্নতির অসুবিধা হইতেছে।

বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্তদিগের সংখ্যাই অধিক। ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা জন্মদাতা পিতার নামে পরিচয় না দিয়া দীক্ষা গুরুর শিষ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়াই শ্লাঘনীয় মনে করে। ধর্মের নামে কিশোরী ভজন ও আনুসঙ্গিক কুপ্রথা গোপনীয়ভাবে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ধর্ম ও সমাজের উন্নতিসাধন জন্য সরকার পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। পূর্বোক্ত ঢুলী, মালী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রজাগণ "গাজী বাদশার" নামেও আনন্দোৎসব করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানেই 'গাজী বাদশার' মোকাম ও মহাদেবের ঢিপি বা মোকাম বলিয়া পরিত্যক্ত নির্জন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঢিপি বা মোকামে তাহারা স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া গীত-বাদ্য ও নৃত্য সহ উৎসব করিয়া থাকে। গানগুলি সাধারণতঃ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। মিলন, বিরহ, জল ভরণ ইত্যাদি বিষয় গ্রাম্য ভাষায় রচিত অনেক গানে কবিত্বের আভাসও পাওয়া যায়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসই ইহাদের এই প্রকার আমোদপ্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব ও গৃহস্থদের কেহ কেহ পুত্র কামনায় কিম্বা অন্য বিশেষ কোন কামনা থাকিলে তজ্জন্য কোন আখড়ার নামে শিশু সন্তান উৎসর্গ করিতে দেখা যায়। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের প্রথা ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নাথ বা দেবনাথ শ্রেণীর চাষী প্রজাগণই অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধও বেশ দেখা যায় কিন্তু কেহ কেহ তাহা অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতেও কুন্ঠিত হয় না। দেবনাথগণ এক সময়ে চতুর্বর্ণের গুরু ছিল। বল্লাল সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ না করায় ইহারা পতিত গণ্য হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ জাতীয় গৌরবের আখ্যায়িকা বলিয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে ইহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী।

মণিপুর রাজ্য বহু প্রাচীন হিন্দু রাজ্য। মণিপুরিদের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। যে সকল মণিপুরী ধর্মনগরে আসিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনায় জানা যায় সাধারণতঃ ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম 'খাইয়া' বা ধলা মণিপুরী, অপর শ্রেণীর নাম "বিষ্ণুপ্রিয়া" বা কাল মণিপুরী। ইহারা রাজগাঙ্গ ও মাদরী (মাতৃ) গাঙ্গ এই দুই নামেও পরিচয় দিয়া থাকে। মণিপুরের রাজপরিবার সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ত্রিপুরাধিপতির বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এই বিভাগে বাস করিতেছেন। তাঁহারা এই স্থানে 'রাজকুমার' বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

মণিপুরিগণ ধর্মনগর বিভাগের অনেক স্থানে জঙ্গলাবাদ করিয়া হাল কর্ষণোপযোগী করিয়াছে। কিন্তু ইহারা সাধারণতঃ বন-জঙ্গলের প্রান্তবর্তী স্থানে বাস করিতেই ভালবাসে। এ জন্য ইহাদের আবাদী স্থান বাঙ্গালীদের নিকট বিক্রয় করিয়া ইহারা পুনঃ পুনঃ বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। মণিপুরিগণকে সাম্প্রদায়িকভাবে রাসলীলা, রাখাল নাচ প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত ধর্মানুষ্ঠান এবং আমোদ-আহ্লাদে যথোচিত একতা প্রকাশ করিয়া উৎসবাদি সম্পন্ন করিতে এই বিভাগেও দেখা যায়। শ্রাদ্ধ ও রাসলীলা উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে যে সামাজিক নিমন্ত্রণ হয় তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রণকারীকে দুগ্ধ, চাউল, চিড়া ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতে দেখা যায় এবং এরূপ করাই তাহাদের সামাজিক নিয়ম বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল হিতকর প্রথা দ্বারা মণিপুরী সমাজ সুগঠিত এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে।

পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে হালাম শ্রেণীর প্রজার সংখ্যাই ধর্মনগর বিভাগে অধিক। হালাম সম্প্রদায় প্রধানতঃ বার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই তিন প্রকারের লোক আছে। ১২৮৯ বাংলা সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "সমালোচনা ও মীমাংসা" গ্রন্থে ইহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। গোমতী নদীর উত্তর ও বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের প্রান্তবর্তী লঙ্গাই নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশেই এখন ইহারা সাধারণতঃ অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে ১২ (বার) 'খিল' হালামও বলে। এই বার খিল ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকার অতিরিক্ত হালাম আছে। আসাম ও লুসাই পার্বত্য প্রদেশেও এই সকল শ্রেণীর বহু হালাম বাস করিতেছে। ধর্মনগর বিভাগের প্রত্যেক হালাম পাড়ায়ই একজন সর্দার আছে। ইহাদিগকে 'মোক্তার' বলা হয়। ইহাদের যোগেই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাধারণতঃ কাজ-কারবার হইয়া থাকে। মুসলমান প্রাধান্যের সময় হইতে এই মোক্তার রাখার প্রচলন হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ অঞ্চলে মোক্তার বা প্রতিনিধি স্বরূপ পাড়ার চৌধুরীগণই কার্য করিয়া থাকে।

খাসিয়া শ্রেণীর পার্বত্য প্রজাগণও কয়েক বৎসর যাবৎ ধর্মনগর বিভাগে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খাসিয়া পান উৎপন্ন করাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহারা টিলাস্থিত জঙ্গলের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নাতি-উচ্চ গাছের অগ্রভাগ কাটিয়া ঝোপের সৃষ্টি করে এবং ঐ সকল গাছের তলায় পানের লতা রোপণ করে; ২।৩ বৎসর পরে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। বরজপান অপেক্ষা এই পান আকারে বড় ও অধিকতর পুরু এবং স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত। খাসিয়াগণ অত্যধিক বিলাসিতাপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আসামে ইংরেজী সভ্যতার সংমিশ্রণই ইহার প্রধান কারণ বলা যায়। হালাম ও খাসিয়াদিগের কথ্য ভাষার সম্বন্ধবাচক কয়েকটি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নিম্নে লিখিত হইল,

যথা ঃ—

বাঙ্গালা	হালাম	খাসিয়া
পিতা	কাপা	ওপা
মাতা	কানু	গেবে
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	আবই	কংসান
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী	কাউনু বা আবই	কংসান
পিতার ভগ্নী (পিসি)	কানি	ইপা
স্বামী	কারুয়াটার	গাচক
শ্বশুর	কাতার পো	ইমা
শাশুড়ী	কাতার পি	এতাড়ে
শ্যালক	কাকুমেইপা	(বড়) ওক
		(ছোট) ওক ইত্যাদি।

এতদঞ্চলের বাঙ্গালীদের ভাষা, উচ্চারণ ও রীতিনীতি, আচারব্যবহার শ্রীহট্ট জিলাবাসীদের ন্যায়। মাহিষ্য দাস শ্রেণীর হিন্দুদিগের অস্পৃশ্ট জল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ পান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না ; কিন্তু দাসের পুরোহিত-ব্রাহ্মণগণ পতিত বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহাদের স্পৃশ্ট জল উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণগণ পান করেন না। গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে দাসের ব্রাহ্মণ মালী শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া পতিত হইয়াছে। কিন্তু দাসের ব্রাহ্মণগণ তাহা স্বীকার করেন না। হিন্দুদিগের বর্ণাশ্রম ও জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে এই প্রকারের বিসদৃশ অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। ধর্মনগর বিভাগের সীমানার প্রান্তবর্তী ব্রিটিশ এলাকায় অনেকগুলি চা-বাগান আছে। এই বিভাগেও কয়েকটি চা-বাগান বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাগান স্থাপিত হইবে আশা করা যায়। ঢুলী, মালী, পাটনী ও কুলি শ্রেণীর দরিদ্র প্রজাদের মধ্যেও এজন্য 'চা-পানির' প্রচলন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মাটির হাড়িতে চা-পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়াই 'চা-পানি' প্রস্তুত ও পান করিতে দেখা যায়। বসিবার আসনের জন্য চেয়ারের প্রচলনও এই অঞ্চলে অধিক। ইহারা চেয়ারকে 'পিড়ি' ও পিড়িকে 'খাট' বলে। নগণ্য মালী, ঢুলীর বাড়ীতেও এই চেয়ার বা পিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সুলভ কাষ্ঠ দ্বারা অনেকে নিজেরাই এই পিড়ি তৈয়ার করিয়া থাকে। ইহাদের প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বাতন্ত্র্য আছে। কেহ কেহ কুকুরকে বলে 'এঙ্গল' এবং সমস্ত অর্থে 'আস্তা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত হালামদিগের পূজাপদ্ধতিতে বিশেষত্ব আছে। হালাম শ্রেণীর পার্বত্য প্রজাদিগকে মিলা কুকীও বলে। ইহাদের আচার-ব্যবহারের সহিত কুকীদের আচার-ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে। হালাম-দিগের ধর্মভাব ভীতি ও স্বার্থমূলক। জুমের দেবতা, নদীর দেবতা, ঝড়-তুফানের দেবতা এবং 'কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও গঙ্গা দেবতার পূজাও তাহাদের কেহ কেহ সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে করিয়া থাকে। পূজাপদ্ধতি পরিবর্তনশীল ; 'ওঝা' বা পূজকদিগের মতানুসারে পূজা হইয়া থাকে। বুড়া দেবতাকে ইহারা অত্যন্ত ভয় করে। মদ্য এবং মাংসই ইহাদের পূজার প্রধান উপকরণ। নিজেরাই ঘরে মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। পচুয়া বা পাচুয়া মদের প্রচলনই অধিক। ত্রিপুরেশ্বরকে ইহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করে ; এ রাজ্যবাসী প্রজাদিগের ইহাই বিশেষত্ব অতএব এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য

ধর্মনগর বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। যে স্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খননের দ্বারা পানীয় জলের সুবিধা করা হইয়াছে এবং যে স্থানের জঙ্গল উপযুক্তরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে সেখানেই সাধারণ স্বাস্থ্য অধিকতর ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। এ রাজ্যবাসী প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সর্ববিধ উন্নতির জন্য সর্বত্র রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় খননের ব্যবস্থা বিশেষভাবে অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। ফটিকুলি টাউনস্থিত ফটিকুলি দীঘির উৎকৃষ্ট জলের দরুন টাউনের স্বাস্থ্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাল। মফঃস্বলের পল্লীগ্রামসমূহে জ্বর, কলেরা ও বসন্ত রোগই প্রতিষেধযোগ্য প্রধান ব্যাধি। ফটিকুলি টাউনে একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন এই বিভাগের অন্য কোন স্থানে সরকার হইতে চিকিৎসার জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। তিলথৈ নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ তত্রত্য বাজারে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একটি টিনের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। বাবু হেমকুমার চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয় এই ব্যক্তিকে 'চৌধুরী' উপাধি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ উপাধি বিতরণ দ্বারা উক্ত ব্যক্তি এখনও রাজ সম্মানে ভূষিত হয় নাই জানা গেল। স্থানীয় প্রজাদিগকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করা হইলে তাহাদের দ্বারাও স্থানীয় উন্নতিজনক কার্যের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ডাক্তার, কবিরাজ এবং পেটেন্ট ঔষধের বাহুল্যবশতঃ যে কু-চিকিৎসা হইতেছে তদপেক্ষা অনেক স্থলে অ-চিকিৎসাই বরং ভাল বলা যাইতে পারে। মণিপুরী প্রজাদের মধ্যে শরীর মর্দনের একপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মণিপুরী বৈদ্যগণ যে কোন ব্যারামেই[১] রোগীর সর্বশরীর মর্দন করিয়া শরীরের অবস্থান্তর উপস্থিত করে; এই প্রকারে জ্বর, পেট বেদনা, আমাশয় প্রভৃতি অনেক ব্যারামই প্রাকৃতিক নিয়মে আরোগ্য হইয়া থাকে। পার্বত্য হালাম, কুকী শ্রেণীর প্রজাগণের ব্যারাম হইলে তাহাদের বিশ্বাস মত দেবতার পূজা দিয়া আরোগ্যলাভ করিতে শুনা যায়। সরল বিশ্বাসই এইরূপ আরোগ্যলাভের প্রধান কারণ মনে করা যাইতে পারে।

ত্রিপুরারাজ্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধর্মনগর বিভাগেও পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব মফঃস্বলের সর্বত্র দেখা যায়। দরিদ্র প্রজাগণ নিজ নিজ চেষ্টায় ছোট ছোট পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলের সামান্যরূপ সংস্থান করিতেছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে তাহা প্রয়োজনানুরূপ নহে। পূর্বে অসংখ্য দীঘি পুষ্করিণী খনন করাইয়া যেভাবে প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার উপায় অবলম্বন করা হইত এখন তাহা করা হয় না। পার্শ্ববর্তী ব্রিটীশ এলাকার চা-বাগানসমূহে নলকূপ ও কূপ খনন দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। মফঃস্বলের প্রজার সংখ্যাল্পতা স্থলে সরকারপক্ষে সে চেষ্টা করিলেই কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে কিন্তু এরূপ নলকূপ বা কূপ খনন অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন দ্বারাই অধিকতর উপকার হইতে পারে। ধর্মনগর বিভাগে অনেক স্থানই উতলা[২] বা কর্দমপূর্ণ জলাভূমি। টিলাভূমির প্রান্তে নিম্নস্থানে কূপের জল উৎকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলাভাবই রোগোৎপত্তির প্রধান কারন। অধিবাসীদিগের জন্ম-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যু সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ সরকার হইতে সংগ্রহ করার সুবিধা নাই। এই বিভাগে শিক্ষিতা ধাত্রী নাই।

১ (ফা) বে+হ্, আরাম (অর্থে সুখ)
২ কর্দমাক্ত জলাভূমি

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থিক অবস্থা

ধর্মনগর বিভাগের নবাগত প্রজাদের প্রায় সমস্তই সাধারণ কৃষিজীবী। তালুকের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইলেও তালুকদারদিগের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীভুক্ত। অধুনা কতকগুলি চা-বাগানের স্বত্বাধিকারিগণ উন্নত প্রণালীতে চা উৎপন্ন করিয়া যৌথভাবে কার্য চালাইতেছেন বটে কিন্তু তাহাতেও অংশীদারগণ এখনও লাভবান হইতে পারিতেছেন না। শ্রম-শিল্প, কুটীর-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনবিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান এই বিভাগে নাই। পার্বত্য প্রজাদের সংখ্যাল্পতা ও জুমের উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ এই বিভাগে জুমোৎপন্ন তিল, কার্পাস মূলক কাজ-কারবার সামান্যই হইয়া থাকে। লঙ্গাই নদী, খাল ও জুরী নদীপথে রপ্তানীকৃত বনজ দ্রব্যাদির রপ্তানী-মাশুল পূর্বে ইজারাদারদিগের দ্বারা সংগৃহীত হইত। এইরূপ ইজারাপ্রথা দ্বারা বনবিভাগের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হওয়ায় বনকর মহাল রাজ সরকারী কর্মচারী দ্বারা খাস তত্ত্বাবধানে শাসন সংরক্ষণের সংকল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তন্মতেই অধুনা কার্য পরিচালিত হইতেছে। ১৩২৩ ত্রিং সনে বন সংক্রান্ত কার্য বিশেষজ্ঞ এবং আসাম প্রদেশের কনজারভেটার মিঃ পেরী সাহেবের সহিত দামছড়া ফরেস্ট আফিসে এ রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ও ধর্মনগর বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মিলিত হইয়া এ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং আসাম ফরেস্ট ম্যানুয়েল অনুসরণ করিয়া এ রাজ্যের বন বিভাগ সম্পর্কিত আইন ও নিয়মাদি প্রণয়ন ও প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। লঙ্গাই নদীর এবং খাল ও জুরী নদীর বনকর মহাল সম্পর্কে ব্রিটিশ ফরেস্টের কর্মচারীদের সহিত এ রাজ্যের কর্মচারীদের কার্যাদি উপলক্ষ্যে যে সকল গোলযোগ দীর্ঘকাল হইতে চলিতেছিল তৎসময়ে ঐ সকল বিষয় মীমাংসারও যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

এই বিভাগ হইতে বনজ দ্রব্য, তিল, কার্পাস, ধান্য ও চাউল ইত্যাদি ব্রিটিশ এলাকার এ. বি. রেলওয়ের জুরী ও লঙ্গাই স্টেশনে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং নদী ও রেল পথে বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। ব্রিটিশ এলাকা হইতে কাপড়, লবণ, তৈল, মরিচ, ডাইল, মৎস্য, মৃন্ময় হাঁড়ি, পাতিল, কলসী ইত্যাদি এবং রাব, তামাক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই বিভাগে আমদানী হইয়া থাকে। হরিশগঞ্জ বাজার, কুতি বাজার, রাগনা বাজার, ফটিকুলি বাজার ও উপ্তাখালি বাজার, এই কয়েকটি বাজার এই বিভাগে আছে। তিলথৈ এবং লঙ্গাই নামক স্থানেও বাজার স্থাপনের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। ফটিকুলি টাউনে একটি বাৎসরিক মেলা এবং কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মাঘ কি ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতে কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতু নির্মিত দ্রব্য ও বহুবিধ বিলাতী জিনিস বহু পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়। কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর, চর্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি কারিগর শ্রেণীর স্থায়ী প্রজা এই বিভাগে নাই। জমির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা ধর্মনগর বিভাগে ধান, চাউল, তরিতরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সর্বদাই সস্তাদরে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। মালী, ঢুলি, কুলী প্রভৃতি শ্রেণীর শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক থাকায় সাধারণতঃ শ্রমিক পাওয়ার অভাব হয় না এবং তাহাদের দৈনিক মজুরী বেশী নহে। কিন্তু উক্ত শ্রমোপজীবী শ্রেণীর বহুলোক কায়েমী তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খরিদ করিয়া মিরাশদার১ গণ্য হওয়ায় এবং সময়ানুসারে শ্রমের

---

১ (অ)—বংশানুক্রমিক মৌরশী ভূসম্পত্তির মালিক।

প্রতি সভ্যতাভিমানী উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের অনাদর ও উপেক্ষার ভাব সৃষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃই এ স্থানেও শ্রমোপজীবীর অভাব হইবে সন্দেহ নাই। এই বিভাগে কোন সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্ক নাই। অধিকাংশ লোকই ঋণগ্রস্ত। সুদের হার শতকরা মাসিক ৩৵০ আনা হইতে ১২৷৷০ আনা পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। সরকার হইতে অল্প সুদে টাকা কর্জ দিয়া প্রজা রক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিস্তার করার উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত।

জলপথে বৎসরের সকল সময় বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না এ জন্য মাল আমদানী-রপ্তানীরও বিশেষ অসুবিধা আছে। মোটরগাড়ী ও গরুর গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা নির্মিত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গমনাগমনের পথ

জুরী ও খাল নদী, কুতি নদী এবং লঙ্গাই নদী এই কয়েকটী নদীই ধর্মনগর বিভাগের সর্বপ্রকার মাল আমদানী-রপ্তানীর উল্লেখযোগ্য জলপথ। তন্মধ্যে লঙ্গাই নদীই অপেক্ষাকৃত গভীর। অন্যান্য নদী পথে বৎসরের সকল সময় অবাধে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এজন্য উৎপন্ন জিনিসের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না পক্ষান্তরে ভিন্ন রাজ্য হইতে আমদানীকৃত জিনিসের মূল্যও অধিক দিতে হয়। নদীগুলিতে অল্প জল থাকায় গোদারাঘাট সম্পর্কেও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। বর্ষার সময় নদীতে জলাধিক্য হইলে কয়েকটি মাত্র গোদারাঘাট সরকার হইতে নির্দিষ্ট জমায় ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। শিলুয়া, ধর্মনগর, ফটিকুলি এই তিনটি মাত্র গোদারাঘাট রাজ-সরকার হইতে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে।

প্রাচীন ধর্মনগরের সমৃদ্ধি থাকার সময়ে এতদঞ্চলে যে অনেকগুলি বড় বড় রাজপথ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে পূর্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অধুনা রাগনা হইতে ফটিকুলি টাউন পর্যন্ত একটি সাধারণ সড়ক ভিন্ন রাজপথ নামের যোগ্য সর্বসাধারণের কোন পথ এই বিভাগে নাই বলা যাইতে পারে। ১৩২১ ত্রিং হইতে ১৩২৩ ত্রিং সন পর্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি সড়ক প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে স্থান নির্ধারণ (এলাইনমেন্ট) ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হইয়াছিল।

(১) রাগনা-ফটিকুলি সড়কের পার্শ্ববর্তী ভাগ্যপুর আবকারী দোকানের সম্মুখ হইতে রাজগী চা-বাগান পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ও পালদিগের বসতি স্থানের মধ্য দিয়া একটি সড়ক।

(২) পাহাড় হইতে শ্রীযুক্ত রাধামোহন চক্রবর্তীর বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া রাগনা বাজার পর্যন্ত একটি সড়ক।

(৩) কুতি তহশীল কাছারী হইতে কালাগাঙ্গের পাড় ও লালছড়া মৌজা হইয়া ধর্মনগর টাউন পর্যন্ত একটি রাস্তা।

(৪) গঙ্গারবিল-নদীয়াপুর মৌজা হইয়া কুতি হইতে ফটিকুলি টাউন পর্যন্ত একটি রাস্তা।

(৫) ফটিকুলি টাউন হইতে আমীর আলী চৌধুরীর বাজার পর্যন্ত একটি এবং দেওছড়া মৌজা হইয়া তিলথৈ মৌজা প্রভৃতির মধ্য দিয়া কুকী নালা পর্যন্ত একটি রাস্তা।

(৬) ফটিকুলি টাউন হইতে কামেশ্বর সিংহের বস্তি হইয়া লঙ্গাই তহশীল কাছারী পর্যন্ত একটি রাস্তা। এই রাস্তা ব্রিটিশ রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্য দিয়া নেওয়ার সুবিধা করিতে পারিলেই ভাল হইবে।

তৎসময়ে আরও ছোট-বড় অনেকগুলি রাস্তার জঙ্গল কাটা ও জরিপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কৈলাসহর হইতে উনকোটী পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নূতন নির্মিত যে পথে পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস্ সাহেব ধর্মনগরে আসিয়াছিলেন সেই পথের উন্নতি সাধনও অত্যাবশ্যকীয় বলিতে হইবে। উক্ত রাস্তাগুলির প্রস্তাবিত স্থান জরিপ ও তদানুষ্ঠানিক কার্যে বহু বাধাবিঘ্ন ও অশান্তি-উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাজপথগুলি নির্মিত হইলে বহু বিষয়ে ধর্মনগর বিভাগের উন্নতি সাধিত হইবে। মাটি কাটাইয়া রাস্তা বাঁধাইবার মাটিয়াল এবং রাস্তায় সেতু নির্মাণের আবশ্যকীয় কাষ্ঠাদি অন্য স্থান হইতে আনাইবার প্রয়োজন হইবে না। বাবু বসন্তকুমার বর্মণ রায় বি, এল, এবং বাবু হেমকুমার চৌধুরী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয়দ্বয় স্থানীয় উন্নতি সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এ বিভাগে কয়েকটি চা-বাগানের বন্দোবস্ত হওয়ায় তাহাদের প্রয়োজনেও রাস্তার সুবন্দোবস্ত করার আবশ্যক হইয়াছে। রাজসরকারী পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে চা-কোম্পানী ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে রাজপথগুলি নির্মিত হইলে অনেক বিষয়ের সুবিধা হইতে পারে। আসাম গভর্ণমেন্টও চা-কোম্পানীর দ্বারা অনেক রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতেছেন। কাশিমনগরনিবাসী আমির আলী চৌধুরী এবং তিলথৈ নিবাসী গণেশ নাথ রাজসরকার হইতে সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত হইলে রাজপথ নির্মাণে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই ভাবে স্থানীয় উন্নতি সাধন সম্পর্কেও রাজপুরুষগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা সঙ্গত।

ধর্মনগর বিভাগে ফটিকুলি টাউনে একটী মাত্র পোষ্টাফিস আছে। এই এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টেল আফিসটিকে ডিপার্টমেন্টেল আফিসে পরিণত করিয়া ইহার সহিত টেলিগ্রামও সংযুক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

ধর্মনগর বিভাগের মৃত্তিকা ও জলবায়ু কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী ; এজন্য এই স্থানের স্থায়ী অধিবাসিগণের কৃষিবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন বলা যাইতে পারে। এই বিভাগে অত্যুচ্চ ও অনুর্বর পর্বত নাই। অধিকাংশ উচ্চ ভূমিই সমতল এবং চা ও ফলের বাগান করিবার উপযুক্ত। নিম্ন ভূমিখণ্ডগুলিও এক একটি বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ। এই সকল মাঠে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। ধান্য উৎপন্ন করাও সামান্য ব্যয় এবং পরিশ্রমসাধ্য। কুতি তহশীল এলাকার নিম্ন সমতল ভূমি বিশেষতঃ আমটীলা, কালাগাঙ্গের পাড়, বকবকী প্রভৃতি অনেক স্থান উতলাপূর্ণ। এই প্রকারের অনেক স্থানে গো-মহিষ দ্বারা লাঙ্গল চালাইতে হয় না ; জমির আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ধান্য রোপণ করিলেই প্রচুর ধান্য ফসল পাওয়া যায়। অন্যবিধ সমতল ও অপেক্ষাকৃত অধিক মৃত্তিকাসংযুক্ত ভূমির ধান্য ফসল অপেক্ষা উতলা ভূমিতে উৎপন্ন ধান্য ওজনে কিছু হালকা ও মোটা রকমের হইয়া থাকে। এই সকল উতলা ভূমির নিম্নদেশে পুরাতন গাছপালার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভূমিকম্পের প্রবল প্রভাবে উচ্চ স্থান ও জঙ্গলা-ভূমিই নিম্নগামী হইয়া উতলাপূর্ণ স্থানে পরিণত হইয়াছে। স্থানের উন্নতি সাধন জন্য বড় ছোট নালা কাটাইয়া এবং নদী ও ছড়ার সহিত ঐ সকলের সংযোগ করিয়া প্রজাগণ উতলা স্থান শুষ্ক করার উপায় অবলম্বন করিতেছে। ১৩২২।১৩২৩ ত্রিং সনে সরকার হইতেও এই সকল কার্যে কতক কতক সাহায্য করা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী কাটাইয়া স্থান উচ্চ ও কৃষির উপযোগী করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ সকল পুষ্করিণীতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে তাহার ২।৩ বৎসরের মাছের মূল্য দ্বারাই ঐ প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় খননের ব্যয় সংকুলান হইতে শুনা গিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রগুলির ভূমি এরূপ উর্বর যে তাহাতে আপাততঃ কোনরূপ সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতিসঞ্চিত সবুজ ও অন্যান্য সার এবং পাহাড়-ধৌত সার দ্বারাই প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণ লাঙ্গল জোয়াল দ্বারা গো-মহিষের সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া হইয়া থাকে—গভীর চাষ কিম্বা বর্ধনশীল ও পাল্টা কৃষি করার উন্নত নিয়ম এই স্থানে প্রচলিত নাই। জমিতে আচড়া বা নিড়ি দিতে হয় না এবং উন্নত রকমের কোনরূপ কৃষি-যন্ত্রও ব্যবহার করা হয় না। পাট পচাইবার জলাভাব ও অসুবিধাবশতঃ এই বিভাগে পাট ক্ষেত কচিৎ দেখা যায়। মুখীকচু, ওল ও হাতীর নখী কচু, কপি, শালগম, সিম, বেগুন, গোল আলু প্রভৃতি তরিতরকারী এই বিভাগে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জমির রাজকীয় পরিমাপ দ্রোণ-কাণি-গণ্ডা হিসাবে হয় ; স্থানীয় লোকে হাল, কেদার প্রভৃতির মাপই ভাল বুঝিয়া থাকে। সাধারণতঃ বার কাণিতে এক হাল জমি ধরিয়া লওয়া হয় এবং এক হাল জমি দ্বারা একটি সাধারণ গৃহস্থ এক লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। জমির কিত্তাগুলি১ অধিক বড় করা হয় না। এই বিভাগের অধিকাংশ স্থানই মণিপুরিদের জঙ্গলাবাদী বলিয়া অন্যান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ মণিপুরিদের ন্যায় পার্শ্ব-বর্তী জমিগুলির আইল অনেক দূর পর্যন্ত সোজাভাবে প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জমি জরিপ কার্যের এবং সীমানার তর্ক মীমাংসা করারও সুবিধা হইয়া থাকে।

---

১ (আ) –ভূমিখণ্ড।

জমির আইল উপযুক্তরূপে প্রশস্ত রাখা হয় না ; ফসল করার সময়ে আইলের উভয় পার্শ্ব কাটিয়া আবর্জনা নষ্ট করা হয় এজন্য আইল আরও ছোট হইয়া পড়ে। এই বিভাগে সাইলো, বোরো, আউস, জুম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপন্ন হয়। কলাই, মুগ, মাস প্রভৃতি ডাইল এবং সরিষার চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ছোট আকারে এবং একটু লাল ও আঠালো রকমের এক-প্রকার গোল আলু এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পাহাড়ের উপরে ও পার্শ্বদেশে খাগড়াই ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে। ইক্ষু গুড় প্রতি সের পাঁচ-ছয় পয়সা দরে শীত ঋতুতে বাজারে খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। রপ্তানীর সুবিধা হইলে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্রব্য অধিকতর মহার্ঘ হইবে সন্দেহ নাই। চুরটের তামাক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তামাকের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কলা ও লেবুর জন্য পূর্বে ধর্মনগর প্রসিদ্ধ ছিল; ক্রমশঃ তাহা মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে।

এই বিভাগের চা-বাগানগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কোম্পানীগুলির পরিচালকগণ সততার সহিত কার্য করিলে ভবিষ্যতে ইহা লাভজনক বিষয় হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এ রাজ্যের চা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদিগের রিপোর্ট আছে; অতএব এ স্থলে অধিক আলোচনা করা হইল না।

আগরতলা সদর বিভাগের অন্তর্গত কাশীপুর সরকারী বাগানে রেশম প্রস্তুত কার্য আরম্ভ হইলে পর কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিভাগের অনেক স্থানেই তুত ও ভেড়নের গাছ উৎপন্ন করার চেষ্টা বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছিল কিন্তু রাজকর্মচারীদের উৎসাহ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের প্রজাদের মধ্যেও আর এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায় না। সরকার পক্ষে ইহা প্রণিধান-যোগ্য।

ধর্মনগর বিভাগের পার্শ্ববর্তী লঙ্গাই অঞ্চলের ব্রিটিশ রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্গত স্থানে অড়হর গাছে গালার কীট পোষণের ব্যবস্থা করিয়া গালা উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছিল; ধর্মনগর বিভাগেও এই সম্পর্কে উপযুক্ত চেষ্টা হইলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে। রাজসরকারী সাহায্য ও প্রচেষ্টা ব্যতীত কৃষি বিষয়ক এই প্রকারের নূতন নূতন জিনিস উৎপাদনের অন্য সহজ উপায় আবিষ্কার সম্ভবপর নহে।

এই বিভাগে সাধারণ শ্রেণীর ঘোড়ার সংখ্যা কম নহে। ব্যবসায়িগণের মোট বহন করা এবং কলুর ঘানি চালান কার্যে ইহারা সাধারণতঃ নিযুক্ত হইয়া থাকে। কৃষকের সর্বশ্রেষ্ঠ বল গো-জাতির এবং মহিষ ও ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ক্রমেই অবনতি হইতেছে। শূকর, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মোরগ, কবুতর ইত্যাদি ব্যবসায়ের ভাবে কেহই পোষণ করে না। পশ্বাদির মড়ক উপস্থিত হইলে গৃহস্থগণ সর্বস্বান্ত হইয়া থাকে কারণ পশ্বাদির চিকিৎসার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা এই বিভাগে নাই। পূর্বের ন্যায় গ্রাম্য চিকিৎসকও এখন পাওয়া যায় না।

স্থানীয় প্রজাদের মধ্যে অধুনা কেহ কেহ কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান প্রস্তুত করার চেষ্টা করিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষিত লোক আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া ফলের বাগান করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে কারণ রাস্তাঘাট সম্পর্কে ক্রমশঃই স্থানীয় উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

স্থান ও ব্যক্তি বিশেষ

কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত থাকার সময়ে ধর্মনগর অঞ্চলের অনেক স্থান কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত দ্বারা ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদূরিত করার চেষ্টা চলিতেছিল। বাবু গিরীশ-চন্দ্র দাস সব-ডেপুটী কালেক্টর থাকার সময়ে ধর্মনগর বিভাগের অনেক স্থান শ্রীহট্ট জিলার খাস মহাল ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকদিগের নিকট জানা যায়। তৎসময়ে সাতসঙ্গম নিবাসী নীলধ্বজ সিংহ মণিপুরীর পিতা রাজ সরকারের ও স্বীয় তালুক সম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদবধি ইঁহারা চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া রাজ সরকারের যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছেন। ইহাদের অবস্থা এখন পূর্বের ন্যায় উন্নত নহে; ঋণ জালে জড়িত হওয়ায় ক্রমশঃই অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

কৈলাসহর বিভাগীয় কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ৮৭ নং কায়েমী তালুকের মালিক ধর্মজিৎ রাজকুমার স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধর্মনগর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট স্থানের কায়েমী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণিপুরের রাজপরিবার সম্পর্কিত বলিয়া ইঁহারা কয়েকজন রাজকুমার বলিয়াই এই বিভাগে সুপরিচিত। পদ্মপুর মৌজায় এই রাজ-কুমারগণ বাস করেন। উক্ত তালুকের অধিকাংশ ভূমিই রাজকুমারগণ বিক্রয় করিয়া স্বত্বত্যাগী হইয়াছেন এজন্য তাঁহাদের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। ধর্মজিৎ রাজকুমারের নাম হইতে ধর্মপুর মৌজার নামকরণ হইয়াছে।

৭৭ নং চন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর নামীয় কায়েমী তালুকও ধর্মনগর বিভাগের একটি উৎকৃষ্ট স্থান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের দ্বারা স্থানীয় বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে মনে করিয়া রাজ-সরকার তাঁহাদের কতিপয় ব্যক্তিকে কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন কিন্তু এই শ্রেণীর অনেক তালুকদারই সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগের নিকট তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিক্রয় করিয়া ঐরূপ কায়েমী বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন। ১৩২৩ ত্রিং সন পর্যন্ত সাধারণ খারিজা তালুক-সহ ধর্মনগর কালেক্টারী তৌজীভুক্ত প্রায় ৮০০ আটশত তালুকের সংখ্যা দ্বারাই মধ্যস্বত্বাধিকারীর ক্ষুদ্রত্ব সূচিত হইতেছে। কোন কোন তালুকদার বার্ষিক দুই-তিন আনা রাজস্বও আদায় করিয়া থাকে।

ধর্মনগর বিভাগ ও ব্রিটিশ রিজার্ভ ফরেস্টের বংশুল ছাতাচূড়া -জরিপী লাইনের বংশুল স্থানান্তরিত হওয়ায় ধর্মনগর বিভাগের সীমানা অনেক পরিমাণে খর্ব হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকদের নিকট শুনা গিয়াছে। বাবু চন্দ্রকান্ত বসু সার্ভে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত থাকার সময় ঐ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত অনেক লিখাপড়াও হইয়াছিল। ১৩১৭ ত্রিং সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পার্টির মিঃ উইলিয়ামস্ ও বাবু প্রমদারঞ্জন রায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগের জরিপ পরতাল[১] করার সময়ে বংশুল ছাতাচূড়া লাইনের বর্তমান অবস্থিতি অনুসারেই সীমানা স্থির করিয়া গিয়াছেন।

---

১ দ্বিতীয়বার জরিপ

এই বিভাগে ফটিকুলি, ধর্মনগর, পদ্মপুর, রাজবাড়ী, পুরান ধর্মনগর, পুরান গারদ, ব্রজেন্দ্রনগর, সাতসঙ্গম, কুর্তি, রাজনগর, তিলথৈ, ইচাই, হাপলং, কালাগাং, দুর্গাপুর, রাগনা, রাণীবাড়ী, দেওছড়া, বিষ্ণুপুর, ফুলবাড়ী, চরাইবাড়ী, শনিছড়া, আশিদ্রোণ, কামেশ্বর গাও, বরুয়াকান্দি, প্রত্যেকরায়, কুকী-নালা, রাধাপুর, উপ্তাখালি, লঙ্গাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ধর্মনগরের কালী বাড়ী শ্যামলাল দেববর্মা ঠাকুর সাহেব বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয়ের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্মনগরের বার্ষিক মেলা বাবু বসন্তকুমার বর্মন রায় বি, এ, বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয়ের সময় প্রথমতঃ 'বাসন্তী উৎসব' নামে স্থাপিত ও পরিচিত হইত। অধুনা ইহার সহিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমান শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নামে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয় 'বীরবিক্রম ইন্‌স্টিটিউশন' দ্বারা স্থানীয় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের বিশেষরূপ বিস্তারের সহায়তা হইতেছে।

কুর্তি তহশীল এলাকার ওয়ারিশ মহম্মদ, সজিদ আলী, ফটিকুলি তহশীল এলাকার সরাফত আলী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি এই এলাকার রোকের অর্থাৎ গাছের কাজ করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে নিজ নিজ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। কেহ কেহ কারবারের প্রয়োজনে একাধিক হাতী খরিদ করিয়াও কার্য চালাইতেছে কিন্তু ইহাদের এই উন্নতির মূলে অনেক স্থলেই সততার অভাব দৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা অধিক সময় ভালরূপে চলিতে কচিৎ দেখা যায়।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত টেঘরিয়া নিবাসী তারক বাবু নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক কুর্তি অঞ্চলে কায়েমী তালুক খরিদ করিয়া স্বীয় ও স্থানীয় উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনি পূর্বে ব্রিটিশ এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং শিক্ষকের কার্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মনগর বিভাগে কর্মক্ষেত্র মনোনীত করিয়াছিলেন।

ধর্মনগর বিভাগের উকীল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় ব্যবসা ও কায়েমী তালুক খরিদক্রমে স্থানীয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

এই বিভাগে পার্বত্য প্রজার সংখ্যা অধিক নহে এবং তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন সর্দার বা চৌধুরী নাই।

পরিশিষ্ট—১

ধর্মনগর বিভাগ

ধর্মনগর তহশীল কাছারী

১৩৩৬ ত্রিং সনের স্থিত বকেয়া বাকীর লিস্ট মতে লিখা হইল।

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবি পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ইচাইর পাড়	৫৸৶১৮৷৷৭৷৷	১০২৸৶৬	২৩১৷৷/৯	৩৩৪৷৷/৩	
২	ইচাইজয়পুর	১৩৷৯//১৫	২০৮৷৵৩	২৪৬৷৷৵৯	৪৫৫/০	
৩	ইয়াকুবনগর	৩৶৯৷৷/	৫০৷৷৶৬	১৩০৸/৬	১৮১৷৷/০	
৪	রাগনা	৩৷৷৶১১/২৷৷	৭২৷৷৯	৬৯৷৵৩	১৪১৸৶০	
৫	প্রত্যেকরায়	৫৪৷৷৵৻//১৭৷৷	৫৮৮৸৯	১৯৯৭৷/০	২৫৮৬/৯	
৬	দিগল বাঁক	২৸৶১৭৸১৫	৪৮৷/৬	৬৩৷/৬	১১১৷৷৶০	
৭	ফটিকুলী	৯৮৸৵৮৸//১০	১৫১১৸৵৬	২২০২৸/৬	৩৭১৪৸০	
৮	রাজবাড়ী টিলাখালী	২২/১৷৷//৫	২৯৭৸/৩	৪৬৭/০	৭৬৪৸৵৩	
৯	উপ্তাখালি	৬৯৷৷/৫৻১৭৷৷	২৯৭৻৬	১৯৫৷৷০	৪৯২৷৷৬	
১০	ভাগ্যপুর	৩৷৷১৪৷৷/১২৷৷	৪৯৷/৩	৫৮/০	১০৭৷৵৩	
১১	শনিছড়া	৫০৷/১৩৷৷১০	৩৮৫৵৯	১১১৬৷৷৵৩	১৫০১৸/০	
১২	দেওছড়া	১০০/৬·//১০	৬৬৮৲	১১৩১/০	১৭৯১/০	
১৩	রাধাপুর	৬৯৷৷/১৫৷৷৭৷৷	৬৭৬/৩	১৫৮৬৸/৩	২২৬২৸৵৬	
১৪	ডলুকান্দি	১৯৷৷৪/১০	২০৪৷৷৶৬	৩২১৶৬	৫২৫৸৶০	
১৫	রাগনা বরুন্নাকান্দি	১১৮৷/৪/	৭০৬৷৵০	১৯৪৫৷৶৩	২৬৫১৸/৩	
১৬	দেওয়ান পাশা	৬৮৷৷/১৸/১৫	৬৮৯৷৷৶৩	২১৪৫৸৶৯	২৮৩৫৷৷৶০	
১৭	ছুপীর বান্দ	৮৷৷০	৪৫৷৷৶০	১৯৮৷০	২৪৩৸৶০	
১৮	হাপলং	৬৫৵১৬৷/১৭৷৷	৬৩২৶০	১৩৩৯/৩	১৯৭১৷৩	
১৯	খাসহন জের	৯৷৷৵১৫	১৪৷৯	৭৫৷০	৮৯৷৷৯	
২০	হ্রাজনগর	৮৲	৭০৵০	৬৬৷৶৬	১৩৬৷৷/৬	
		৭৮৭৷৷৶১৩৸/১২৷৷	৭৩২০৶৩	১৫৫৮৯৵০	২২৯০৯৷/৩	

ধর্মনগর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ইজা—	৭৮৭॥৶১৩৸/১২॥	৭৩২০৶৩	১৫৫৮৯৵০	২২৯০৯।/৩	
২১	হুরুয়া ধর্মপুর	১৯৯।/৯//১৫	১১৮১।৵৯	২৯১০।/৩	৪০৯১৸০	
২২	মঙ্গল খাঁসী	২৫।৵৮//১৫	১৬২।৬	২৮৫॥৯	৪৪৭৸/৩	
২৩	জামির আলা	৶০	১॥/৬	১৩।/৬	১৪৸৶০	
২৪	সাবাজপুর	৪।১/১৫	২৬/৬	৬১/৯	৮৭৶৩	
২৫	রৌয়া	৯৯।/১২৸//১৭॥	৫৩৬।/৯	২৮৪৭/৩	৩৩৮৩।৶০	
২৬	যুবরাজনগর	৩১৸৶৭//২॥	১৮৪/৬	৪১৫।৵৩	৫৯৯।৶৯	
২৭	কুকি নালা	১৪৸১৫	৫০৵৬	৪৮২৸৶৩	৫৩৩/৯	
২৮	গজানগর	১০০॥৶১১৻১২॥	৭৮০৸৵০	৮৫০৶৬	১৬৩১/৬	
২৯	তিলাথৈ	১০২।৶৻/১৫	৭৬৬।/০	১৫১০॥৵৬	২২৭৬৸৶৬	
৩০	পদ্মবিল	৫৫৵৪॥/১২॥	২৩১৻৬	২৫৪॥৵৬	৪৮৫॥৶০	
৩১	বিলাথৈ	২৲	৮॥০	২৮।৶০	৩৭৶০	
৩২	পানিসাগর	৫২৸৶৪/৭॥	২৪০।৯	৫২৯/৬	৭৬৯।৵৩	
৩৩	খাস ইক্ষু ক্ষেত্র	॥৶১০	১২৶৬	১২৭॥/০	১৩৯৸৬	
৩৪	কুঞ্জনগর	৩৸০	×	×	×	
৩৫	টিলী বাড়ী	৸০	×	×	×	
	মোট—	১৪৮১।৶১৭৸/৫	১১৫০১।৶০	২৫১০৫৸০	৩৭৪০৭৶০	

পরিশিষ্ট—২

ধর্মনগর বিভাগ

ব্রাজেন্দ্রনগর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিরজানগর	৪৪৷৷১৪৷৷//১০	৬৬১৸৵৯	১৩০৮৷৷৵৯	১৯৭০৷৷/৬	
২	ব্রজেন্দ্রনগর	১০২/৻৷/১৫	১১৯৮৷/০	২৪৫১৷৷৶০	৩৬৫০৲	
৩	খুলিতহর	১২১৷৵৩৷৷৭৷৷০	৮৯৷/৩	৩৮৯৷৷৯	৪৭৮৸৵০	
৪	হরিশগঞ্জ বাজার	৻১১//২৷ ০	৫৷৷০	৭৮৷/০	৮৩৸/০	
৫	বামনীয়া	৩২৷৬৷/১৭৷৷০	২৪৬৷৩	১০৫৭৷৵৬	১৩০৩৷৷৵৯	
৬	পুরান আরদ	৭৻৪৷//২৷৷০	৯৩৷৷৵০	৪০৬/৯	৪৯৯৷৷৶৯	
৭	যিষ্ণুপুর	৫৮৷৶১৯৸১৭৷৷	৫৫১৷৷৬	১০১৩৶৯	১৫৬৪৸৬	
৮	টেকনী	৯৭৷৵৯৸//২৷৷	১৭৮৸৵৬	৮২১৷৷৵৯	১০০০৷৷/৩	
৯	সরশপুর	১১৵৬/	৮২৷৷৬	৬৬৷৷৵৯	১৪৯৶৩	
১০	বগবগী পূর্বপাড়	৩৬৷৷১৷১২৷৷	২৯৪৷৶০	৭৯৯৷৷/৯	১০৯৪৻৯	
১১	বগবগী গোপালনগর	২১৷৷/৩/৫	২৩৫৻৯	৩২৯৶৩	৫৬৪৷০	
১২	চিতল তহর	৬/১৯//	৭৪৻৬	৫২৸০	১২৬৸৬	
১৩	আমটীলা	৬০৶৮×৭৷৷	৩৯৯৸৬	১২৬৪৸৵৯	১৬৬৪৷৷৶৩	
১৪	ইচাই চিলুগাও	১৮৸৶৫৷৷৫	১৮৭৷০	৪৬০৻৩	৬৪৭৷৩	
১৫	লালছড়া	৫৬৻৮৸//৫	৪৫১৷৵	১০৫৷৶৯	১৩৫৬৸/৯	
১৬	সোনাইছড়া	২০৸/১৭৷৷	১১৫৵০	৩৭৫৻৬	৪৯০৵৬	
১৭	খাস হল জোত	১৸/৭৷/১৫	১৫৷/৩	৯৯২৸/	১২৮৵৩	
১৮	সাতসজম	২০৷৷২৷৷/৪	১৬৮৻৩	৪৪৯৻৬	৬১৭৻৯	
	মোট	৫২৭৸৶১০৷১০	৫০৪৮৷/৩	১২৬৪২৵৯	১৭৬৬০৷৷০	

পরিশিষ্ট—৩

কুতি তহশীল কাছারী

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবী পথকরসহ	বকয়া বাকী পথকরসহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	রাজনগর	১১৭॥/১০২॥	৮৩৭৸/০	১৬২২।/৯	২৪৬০৶৯	
২	কালাগাঙ্গের পার	২৮।৻॥/১৫	২৪৩/৯	৩৫৯॥৶৩	৬০২৸/০	
৩	বাঘন	৮০॥৵৻॥//৫	৬১৭।৬	১৬৯৮।৶৩	২৩১৫॥৶৯	
৪	চড়াইবাড়ী	৭৯৻১৬//১৫	৫৭২৶০	৫৩৩৶৬	১০৭৫।৵৬	
৫	ফুলবাড়ী	১০১৵৻৸৭॥	৮৯৫।৵৬	৯০৬৶০	১৮০১॥/৬	
৬	মোহনটেকী	৩৯৸১২৸২॥	২১৮।৵৯	১২৯১৵৩	১৫০৯॥/০	
৭	জালাইবাড়ী	৩২।৵৫।২॥	১৮১॥৩	৩৯০৻৩	৫৮১॥৬	
৮	কুতি বাজার	×	১৮।/৩	১৩।৬	৩১॥/৯	
৯	বড়গোল	৪৬৸/১৮//২॥	৩২৩৸/৯	৭৮৯৸৯	১১১৩॥৵৬	
১০	লক্ষ্মীগোল	২২।৶১৮।//৫	১৪৩।/৩	১৯৯॥/৩	৩৪২৸৶৬	
	মোট	৫৪৮৶২৸//১৭॥	৪০২১।০	৭৮০৩॥৶৯	১১৮২৪৸৶৯	

লক্ষাই তহশীল কাছারী

১	নরেন্দ্রনগর	২৫॥০	১২২॥৶৬	৩৬৩॥৵০	৪৮৬।/৬	
২	বামীছড়া	৪৲	১৭৲	৮৫৲	১০২৲	
	মোট	২৯॥	১৩৯॥৶৬	৪৪৮॥৵০	৫৮৮।/৬	
১	ধর্মনগর তহশীল কাছারী	১৪৮১।৶১৭৸/৫	১১৫০১।৶০	২৫৯০৫৸০	৩৭৪০৭৶০	
২	রাজেন্দ্রনগর তহশীল কাছারী	৫২৭৸৶১০।১০	৫০৪৮।/৩	১২৩৪২৵৯	১৭৩৯০॥০	
৩	কুতি তহশীল কাছারী	৫৪৮৶২৸//১৭॥	৪০২১।০	৭৮০৩॥৶৯	১১৮২৪৸৶৯	
	ধর্মনগর বিভাগের খাস জমির মোট	২৫৮৭৵/১১×৻১২॥	২০৭১০॥৶৯	৪৬৫০০।৬	৬৭২১১৻৩	

পরিশিষ্ট—৪

ধর্মনগর বিভাগের চা-বাগান সমুহের স্টেটমেন্ট

ইতি—২৬।৯।৪০ খ্রিং

ক্রমিক নম্বর	তসখিচি তালুকের নম্বর	চা-বাগা'নর নাম	ভুমির পরিমাণ	বার্ষিক রাজস্ব পূঃবঃ কর সহ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১	রাণীবাড়ী	৩১৫/১৩।/০	২৬৭৮।৶৬	
২	২	ধর্মনগর	২২৫৲	১৯১২॥০	
৩	৩	হাপলং	৩১৫৲	২৬৭৭॥০	
৪	৪	পিয়াড়াছড়া	১৫৮৲	১৩৪৩৲	
৫	৫	আহাম্মদপুর	১৯০৲	১৬১৫৲	
৬	৬	ফুলবাড়ী লংলা	৭৮৲	৬৬৩৲	

Sd/- J. Ganguly
I/c Divisional Officer
Dharmanagar

পরিশিষ্ট—৫

ধর্মনগর বিভাগে ১৩১৩ ত্রিং সন হইতে যে সমস্ত ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক কার্য করিয়াছেন তাঁহাদের নামের লিষ্ট

ক্রমিক নং	ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারকগণের নাম	কার্যকাল	মন্তব্য
১।	শ্রীযুত দ্বারকানাথ দত্ত কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্	১৩১৩ ত্রিং বৈশাখ হইতে ১৩১৬ ত্রিং বৈশাখ পর্যন্ত।	১৩০৫ ত্রিং সনে এই বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ১৩১৩ ত্রিং সনের পূর্বের
২।	শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল	১৩১৬ ত্রিং ৩০শে বৈশাখ হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত।	পুরাতন রেকর্ড অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই।
৩।	শ্রীযুত ত্রিবেণীমোহন বৰ্দ্ধন	১৩১৬ ত্রিং ২৩শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩১৭ ত্রিং ২০শে ভাদ্র পর্যন্ত।	
৪।	শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র দত্ত	১৩১৭ ত্রিং ২০শে ভাদ্র হইতে ১৩১৮ ত্রিং ১০ই মাঘ পর্যন্ত। ১৩২১ ত্রিং আষাঢ় হইতে ১৩২৪ ত্রিং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত।	
৫।	শ্রীযুত রেবতীমোহন দেববর্মণ	১৩১৮ ত্রিং ১০ই মাঘ হইতে ১৩১৯ ত্রিং ২৫শে বৈশাখ পর্যন্ত। ১৩২৬ ত্রিং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস।	
৬।	শ্রীযুত তড়িৎমোহন গুপ্ত	১৩১৯ ত্রিং ২৬শে বৈশাখ হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। ১৩২৫ ত্রিং কার্তিক হইতে ১৩২৬ ত্রিং বৈশাখ পর্যন্ত। ১৩৩৪ ত্রিং ১৭ই ফাল্গুন হইতে চৈত্র পর্যন্ত।	
৭।	শ্রীযুত প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য	১৩১৯ ত্রিং ২২শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩২১ ত্রিং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত।	
৮।	শ্রীযুত কুসুমকুমার সেন	১৩২৪ ত্রিং সনের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩২৫ ত্রিং আশ্বিন পর্যন্ত।	
৯।	শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র সেন	১৩২৬ ত্রিং শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত।	

পরিশিষ্ট—৬

ক্রমিক নং	ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের নাম	কার্যকাল	মন্তব্য
১০।	শ্রীযুত রামকমল চক্রবর্তী	১৩৩৭ ত্রিং বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত।	
১১।	শ্রীযুত হেমকুমার চৌধুরী	১৩২৮ ত্রিং বৈশাখ হইতে ১৩৩১ ত্রিং পর্যন্ত।	
১২।	শ্রীযুত সারদাচরণ সরকার	১৩৩১ ত্রিং বৈশাখ হইতে ১৩৩৪ ত্রিং ১৭ই বৈশাখ পর্যন্ত।	
১৩।	শ্রীযুত রমণীমোহন গোস্বামী	১৩৩৪ ত্রিং ১৮ই বৈশাখ হইতে মাঘ পর্যন্ত।	
১৪।	শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী	১৩৩৫ ত্রিং হইতে ১৩৩৭ ত্রিং পৌষ পর্যন্ত।	
১৫।	শ্রীযুত ললিতমোহন দেববর্মণ	১৩৩৭ ত্রিং মাঘ হইতে ১৩৩৮ ত্রিং ৭ই আষাঢ় পর্যন্ত।	
১৬।	শ্রীযুত অখিলচন্দ্র মজুমদার	১৩৩৮ ত্রিং ৭ই আষাঢ় হইতে বর্তমানে কার্য করিতেছেন।	
১৭।	শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 2nd Officer.	১৩৩৮ ত্রিং মাঘ মাস হইতে বর্তমানেও কার্য করিতেছেন।	

J. Ganguly
I/C Divisional Officer
Dharmanagar